Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতাবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এম. মতিউর রহমান
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
তাপসী রাবেয়া
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-১৫
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর ২০২০

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় পিতা আব্দুর রহমান

মাতা আনোয়ারা বেগম

ও

পুত্র তাহ্‌মীদ-কে

Dhaka University Institutional Repository

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, **তাপসী রাবেয়া**, এম.ফিল. গবেষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, আমার তত্ত্বাবধানে **"রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতাবাদ"** শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. প্রোগ্রামের আওতায় তাঁর এই এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল. বা উচ্চতর কোন ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি। আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর সম্পূর্ণ গবেষণার খসড়া ও অধ্যায়গুলো চূড়ান্তভাবে পাঠ করেছি এবং তাঁর এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের অংশ হিসেবে অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মনে করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে(থিসিসে) কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

ড. এম. মতিউর রহমান
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Phone: PABX 9661920-73 Ext. 6240, 6241, Fax: 880-2-9667222, E-mail: chairphilosophydu.@gmail.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতাবাদ"** এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি। নির্দেশিত অংশ ব্যতিত বাকি অংশ আমার নিজের। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল. বা উচ্চতর কোন ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো ঘোষণা করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে(থিসিসে) কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

তাপসী রাবেয়া

তাপসী রাবেয়া
এম.ফিল. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

উচ্চতর গবেষণা ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে পথিকৃতের নিদর্শন স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে দর্শন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকটি উচ্চতর ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক, পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম. মতিউর রহমান গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে অপরিসীম ধৈর্য সহকারে সহযোগিতা করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম করেছেন। তিনি প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি আমার ঋণ ও গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ গবেষণায় আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং দর্শন বিভাগ সেমিনারে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের অনেকে নানাভাবে আমাকে প্রেরণা ও সহায়তা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গবেষণা সহায়ক বইপত্র ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আমার সব সময়ের বন্ধু ও সাথী মো: রাসেল মনি সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

তাপসী রাবেয়া

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনাম	i
উৎসর্গ	ii
প্রত্যয়ন পত্র	iii
ঘোষণা পত্র	iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	v
সূচিপত্র	vi-vii
ভূমিকা	১-৬
প্রথম অধ্যায়: মানবতাবাদ	৭-১৯
১.১ মানবতাবাদের উৎপত্তি	৮-৯
১.২ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারায় মানবতাবাদী চিন্তা	১০-১৩
১.৩ প্রাচ্য মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা	১৩-১৭
১.৪ বিশ্ব ধর্মতত্ত্বে মানবতাবাদ	১৭-১৮
তথ্য নির্দেশিকা	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলায় মানবতাবাদ	২০-২৯
২.১ প্রাচীন যুগের বাংলায় মানবতাবাদ	২১-২৩
২.২ মধ্য যুগের বাংলায় মানবতাবাদ	২৩-২৮
তথ্য নির্দেশিকা	২৯
তৃতীয় অধ্যায়: রবীন্দ্র দর্শন পরিচয়	৩০-৪১
৩.১ দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ	৩১-৩৩
৩.২ রাজনৈতিক দর্শন	৩৩-৩৫
৩.৩ ধর্মদর্শন	৩৫-৩৬
৩.৪ শিক্ষাদর্শন	৩৬-৩৭
৩.৫ সমাজ দর্শন	৩৭-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ মরমিবাদ ৩৮-৩৯
৩.৭ নারী স্বাধীনতার সমর্থন ৩৯
৩.৮ ঈশ্বরচেতনা ও মানবতা ৪০
তথ্য নির্দেশিকা ৪১
চতুর্থ অধ্যায় : রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতাবাদ ৪২-৯৩
৪.১ রবীন্দ্র কাব্য-কবিতায় মানবতাবাদ ৪৫-৬৭
৪.২ রবীন্দ্র ছোটগল্পে মানবতাবাদ ৬৭-৭৫
৪.৩ রবীন্দ্র উপন্যাসে মানবতাবাদ ৭৫-৮০
৪.৪ রবীন্দ্র নাটকে মানবতাবাদ ৮০-৮৬
৪.৫ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ডায়রিতে মানবতাবাদ ৮৬-৯১
তথ্য নির্দেশিকা ৯২-৯৩
পঞ্চম অধ্যায়: রবীন্দ্র ভাবনায় শ্রেয় ও প্রেয় ৯৪-১০৩
৫.১ শ্রেয় ও প্রেয় ৯৬-৯৭
৫.২ রবীন্দ্র ভাবনায় শ্রেয় ও প্রেয় ৯৮-১০২
তথ্য নির্দেশিকা ১০৩
উপসংহার ১০৪-১০৭
গ্রন্থপঞ্জি ১০৮-১১২
প্রাথমিক উৎস ১০৯-১১০
সহায়ক উৎস ১১১-১১২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অবিস্মরণীয় । তিনি তাঁর কবিকর্মে নানা প্রকার মৌলিকতা বিকাশের সাথে সাথে যুগচিন্তার সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে মানুষের মনে বিরাট এক স্থান দখল করে আছেন। তাঁর সময়কাল মানবমহিমা ঘোষণার সময়কাল। তিনি তাঁর কবিতা, কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপ্রতিহত প্রভাব দেখিয়েছেন। তাঁর কর্মের যেখানে মানবতাবাদ ও সাম্যবাদী চিন্তাধারার স্পর্শ আছে কেবল সেগুলোই এখানে আলোচ্য।

তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক কবি এবং তাঁর বিচার বিশ্লেষণ দিয়েই তিনি ধর্মীয় বিধি বিধান ও আচার অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করেছেন। মূলত ধর্মীয় প্রত্যয় ও অনুভূতিকে আশ্রয় করে তাঁর চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। তবে একথা সত্যি যে, তাঁর ভাবজীবনের মূল উৎস হলো উপনিষদ এবং তাঁর পূর্বাচার্য হিসেবে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুসরণ করেছেন। তিনি বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণের আলোকে ধর্মকে দেখতে চেয়েছেন। বিশ্ববাসীর মুক্তি, শান্তি তথা সর্বোপরি কল্যাণের জন্য তিনি মানবতার হাত বাড়িয়েছেন।

তিনি কল্যাণ পথের অভিসারী হিসেবে বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয় এবং জীবনের প্রতি সুদৃষ্টি দিয়ে সমাজ সংসারে থেকেই মুক্তি কামনা করেছেন। অসীমকে পাওয়ার জন্য তিনি আত্মত্যাগ ও সেবা ধর্মের কথা বলেছেন যার মাধ্যমে মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বমানবতার কবি হিসেবে তিনি মানুষের মাঝে নিজেকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছেন, সসীমের মধ্য দিয়ে অসীমকে লাভ করতে চেয়েছেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ঐক্য ও অখণ্ডতাবোধের আলোকে মানুষকে আপন করেছেন। মানুষের মধ্যে যখন প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের স্নিগ্ধ অনুভূতি জাগ্রত হয় তখন মানুষ বিশ্ব মানবতাবোধে নিজেকে আবদ্ধ করে। তাঁর এ স্নিগ্ধ অনুভূতির কথা, মানবতার ধর্মের কথা, মানবসত্যের প্রচারের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর 'The Religion of Man' এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থদ্বয়ে। কবি বিশ্বজনীন মানবতা, বৈশ্বিক মানবতাবোধের কথা উচ্চারণ করেছেন তাঁর ১৯৩০ সালের সুপ্রসিদ্ধ হিবার্ট বক্তৃতায়, একই মানবসত্য বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক হিবার্ট বক্তৃতার ভাবানুবাদে। বাঙালি জাতির অহংকার বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

তাঁর অসংখ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি' তাঁকে বিশ্বব্যাপী সাহিত্যখ্যাতি এনে দেয়। তিনি বৈশ্বিক মানবতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে তাঁদের দুয়ারে প্রণাম নিবেদন করেন যারা মানুষকে মানবতার তীর্থে

পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। এ জন্যই বিশ্ববাসী তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে। বিশ্বজনীন মানবতার উপলব্ধিতে সমগ্র পৃথিবীকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন বলেই পরবর্তীতে নোবেল পাওয়ার দু'বছর পরই ১৯১৫ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ নিজের জন্মদিনে তাকে 'নাইটহুড' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ এজন্য তিনি সবসময় হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক কামনা করে তাঁদের মিলন চেয়েছেন। তিনি প্রজাহিতৈষী জমিদার ছিলেন এজন্য প্রজারাও তাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সুশিক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়। তিনি যখন নোবেল পুরস্কার পান তার পরের বছর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে সমগ্র বিশ্ব উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় অন্ধ, স্বার্থপর ও নৃশংস হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ এমন সংকীর্ণ মুহূর্তে, জাতির মুক্তি কামনায় সম্পূর্ণ নতুন ধর্মচেতনা বিশ্বজনীন মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা নিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেন এক সুন্দর আগামী গড়ার লক্ষ্যে। তিনি আত্মার পরিশুদ্ধতার বিকাশ লাভের কথা বলেছেন। তিনি জীবনের লক্ষ্য ও শিক্ষার লক্ষ্যকে এক মনে করেছেন এজন্য পুঁথিগত বিদ্যার সাথে মানবতার শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হলেই মনের পূর্ণতার সাথে সংসারের আবার সংসারের পূর্ণতার সাথে মনের পূর্ণতার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে।

মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মা সবসময় মানুষের কল্যাণ কামনায় ব্যতিব্যস্ত ছিল। সমাজের প্রতি, সমাজের মানুষের প্রতি আন্তরিকতা ও কল্যাণবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কবিতা, কাব্য, গল্প, নাটক ও উপন্যাসে। জমিদার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের প্রতি গভীর বেদনা তাঁর সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি সামাজিক সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন এর উৎস খুঁজে বের করে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর ঋষিদৃষ্টিতে দেশমাতৃকার অশিক্ষা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, মানসিক ও সামাজিক অধোগতি কোনকিছুই বাদ যায়নি। এসব লক্ষ্য করে সমাধানের জন্য তিনি মানবতার আলোকে মুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যে আন্দোলন চিত্তের মুক্তি সাধন করবে, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও মমত্ব বোধ জাগাবে, সকল প্রকার অবিদ্যাকে জয় করবে, সকল জাতিভেদ ভুলিয়ে দিবে এবং শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদার কথা বলবে এমন আন্দোলন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সাধিত করতে চেয়েছেন। তাঁর জীবনদর্শন পর্যালোচনা করে বুঝা যায় যে, তিনি কতটা মানবপ্রেমিক ছিলেন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে পারলে সমগ্র পৃথিবী আরো অনেক বেশি সুন্দর ও বসবাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

তাঁর আবির্ভাব এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন নতুন ও পুরাতনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি বিচক্ষণতার সাথে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূল্যায়ন করে এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। রবীন্দ্র সাহিত্যে স্থান পেয়েছে অধ্যাত্মচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, বিশ্বপ্রেম সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি সকল প্রকার অসাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক ভেদাভেদ, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং এই ঈশ্বরের মূল তিনি মানব সংসারের মধ্য থেকেই খুঁজেছেন। বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ সংগীত ও নৃত্যকেও গুরুত্ব দিয়েছেন, অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গান ভারতীয় প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে।

মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের সব আলোচনা ও কর্মের মূলে ছিল মানুষ। তিনি বৈশ্বিক মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মানবতাবাদ ও মানবতাবোধের শিক্ষা যুগ যুগ ধরে বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করে আসছে। তাঁর সাহিত্য মানুষকে অনুরণিত করার পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যে মানবতাবাদের ব্যবহার মানবসমাজকে আলোকিত করে। মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, সহানুভূতি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে একটি সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণকামী বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব। সমগ্র বিশ্বে আজ মানবতাবোধ ও মানবতাবাদের যে অবনতি সেজন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁর মানবতাবাদের শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই মানবতার এমন সংকট উত্তোরণে রবীন্দ্রনাথ এক জীবন্ময় প্রেরণা উৎস। আলোচ্য এই অভিসন্দর্ভে তাঁর মানবতাবাদ, দর্শন, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ চিন্তা এসব বিষয় আলোচনা করে সমসাময়িক বিশ্বে সমাজ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ঘটনাগুলো বুঝার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এখানে বর্তমান সময়ে তাঁর মানবতাবাদের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ে 'মানবতাবাদ' শিরোনামে মানবতাবাদের উৎপত্তি, পাশ্চাত্য-জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারায় মানবতাবাদ, প্রাচ্যে মানবতাবাদের চিন্তা-চেতনার ধরন, বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম গুলোর আলোকে মানবতাবাদের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উৎপত্তিগত অর্থে মানবতাবাদের মূল সুর, প্রাচীন যুগের পণ্ডিতদের দর্শনে এর ব্যাপক ব্যবহার, পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দর্শনে নৈতিকতার প্রভাব, পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদ

উপযোগবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের সাথে মানবতাবাদের সামঞ্জস্য এসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসব মানবপ্রেমিকের আবির্ভাব হয় তাঁরা মানবপ্রীতি ও মানবমৈত্রীর শিক্ষা দেন তাঁদের দর্শন মনুষ্যত্ববোধকে আশ্রয় করেই প্রচারিত হয় এগুলো বিষয়ও বলা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মে মানবতার স্থান এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবতাবাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলায় মানবতাবাদের স্থান, প্রভাব ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এসব যুগের বাঙালি মানবতাবাদী দার্শনিকদের দর্শন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগের ইহজাগতিক মানবতাবাদের মূলে চার্বাক দর্শন ছিল। অন্যদিকে পারলৌকিক মানবতাবাদ বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় মতবাদের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় বিভিন্ন কবি, সুফি দার্শনিক, বৈষ্ণববাদী, বাউল সম্প্রদায়, ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী সবাই মানবতার উপর জোর দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করে তিনি যে একজন মানবতাবাদী দার্শনিক ছিলেন তৃতীয় অধ্যায়ে সেটাই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তিনি বিশেষ কোনো অঙ্গনের ছিলেন না, প্রতিটা বিষয়ে তাঁর পদচারণা রয়েছে। তিনি তাঁর জীবনজুড়ে মানবতার কথা বলেছেন এবং তাঁর রচনাকে আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ করেছে। তিনি তাঁর রচনাকর্মে মানুষের চিত্তের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানবতার মুক্তির দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি বৈশ্বিক দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখেছেন, মানুষের জন্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সর্বোপরি দার্শনিক জ্ঞান ও মানবপ্রেমের সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করার মাধ্যমে মানুষকে মানবকল্যাণে উৎসাহিত করে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ডায়রির যেসবে মানবতাবাদ স্থান পেয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। মানবিক কবি সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যকে তিনি বিশুদ্ধ গীতিময়তায় সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর জীবনবোধ, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবপ্রেম, মননশীলতা এসবকিছু শেষ পর্যন্ত মানবতাবোধ ও মানবতাবাদকেই স্পর্শ করেছে। তিনি যে সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে মানুষকেই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করে তিনি হৃদয়াশক্তি, সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির সমন্বয়ে ব্যক্তির মধ্যে সামগ্রিক

সত্তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সন্ধানের মাধ্যমে মানবজীবনের বহুমাত্রিক রূপ অনুসন্ধান করাই তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য ছিল সে বিষয়গুলোও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

রবীন্দ্র ভাবনায় শ্রেয় ও প্রেয়র ভূমিকা এবং শ্রেয়দর্শনের উপর যে তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সেই বিষয়টি পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অল্প সময়ে পাওয়া যায়, ক্ষণস্থায়ী এবং অন্তিমে দুঃখজনক এমন বৈশিষ্ট্য ধারণ করা প্রেয়র চেয়ে তিনি লাভ করা পরিশ্রম সাপেক্ষ কিন্ত চিরস্থায়ী এবং সুখদায়ক এমন গুণের শ্রেয়কে তিনি সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, শ্রেয় লাভ করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ বিষয়। তিনি শ্রেয় সাধনাকে মানুষের আত্মোপলব্ধির সাধনা এবং এর মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব বলে মনে করেন।

এখানে মানবতাবাদের বিভিন্ন দিকসহ রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান অস্থিতিশীল বিশ্বে শান্তি-স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়। রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতার ব্যবহার যুগ যুগ ধরে বিশ্ববাসীকে প্রভাবিত করে আসছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁর মানবতাবাদের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া, সমসাময়িক বিশ্বে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের অধিকাংশ ঘটনাগুলো বুঝার জন্য এই গবেষণাটি সহায়ক হবে বলে মনে হয়।

প্রথম অধ্যায়

মানবতাবাদ

মানবতাবাদ

মানবতাবাদ মূলত মানবকেন্দ্রিক একটা দার্শনিক আন্দোলন যা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে মানবদয়াকেই পরম কল্যাণ হিসেবে গ্রহণ করে। আর এর চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে মানব প্রজ্ঞা, নৈতিকতা এবং ন্যায়পরায়ণতা। মানবতাবাদ মানুষকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য তাঁর ভেতরে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং ভয় দূর করে। সর্বোপরি মানুষ যে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে লুক্কায়িত বৃহৎ শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের কথা বলে।

বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত তথা প্রচলিত মানবতাবাদ শব্দটির নিগুঢ় তাৎপর্য রয়েছে। কেননা, মানবজীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক তথা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। উৎপত্তিগত অর্থে মানবাত্মার নিজস্ব পূর্ণতার বিকাশ সাধন করাকে মানবতাবাদ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন "অপার্থিব থেকে পার্থিবের প্রতি, স্বর্গলোকের দেবতা থেকে মর্ত্যলোকের মানুষের প্রতি অদৃশ্য অলৌকিক জগতের ধেকে দৃশ্যমান বহির্জগতের প্রতি মানুষের চিন্তাধারা পরিচালিত এবং কেন্দ্রীভূত করাই হিউম্যানিস্ট আদেশ।" [১] মানুষের উপর গুরুত্ব দিয়ে এ মতবাদ সবসময় মানবকেন্দ্রিক চিন্তাই করে।

১.১ মানবতাবাদের উৎপত্তি

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে সোফিস্ট দার্শনিকেরা দর্শন সম্পর্কে পরম্পরাগত ধারণার অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়ে মানতাবাদী দর্শনের প্রথম প্রচার ঘটান। যেখানে পূর্বের দার্শনিকরা দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে জগৎকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে সোফিস্টরা বললেন, "জগৎ নয়, মানুষ নিজেই তার আলোচনা ও অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য ও উপজীব্য। এভাবে তাঁরা দর্শনের ইতিহাসে এমন এক গতিশীল ও প্রাণবন্ত মানবতাবাদের সূচনা করেন যার ফলে দার্শনিক চিন্তায় উম্মোচিত হয় এক নতুন দিগন্ত।" [২] ল্যাটিন শব্দ 'মানবতা' থেকেই মূলত মানবতাবাদের উৎপত্তি এবং এর প্রধান ও প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল ইতালি। অর্থাৎ ইতালি থেকেই এর ব্যাপক পরিচিতি ও প্রসার লাভ করে। এবং আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গভীর অনুশীলন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ইতালিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে সেখানে প্রাচীন গ্রিস ও রোমান সভ্যতার সমৃদ্ধি ঘটে। এর প্রেক্ষিতে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে এবং যুক্তিবাদী মানুষ ধর্মের অন্তর্নিহিত বিষয় উপলব্ধি করে এবং পরবর্তীতে এর ফলে মানুষ আত্মনিমগ্নতা কে ত্যাগ করে আত্মমর্যাদার গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হয়

যা মানুষের মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ইতালির মানবতাবাদের প্রসার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। মানবতাবাদের কেন্দ্র ইতালিতে হলেও এর বীজ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল সভ্যতার শুরু থেকেই, এবং মানবতাবাদ প্রাচীন যুগের পণ্ডিতদের দর্শনে ব্যাপক পবির্তন ঘটায়।

ইতালির মানবতাবাদ রেনেসাঁ নামে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এবং এর ফলে মানবতাবাদ চেতনার বিকাশ ঘটে। ইতালীয় দার্শনিক দান্তে আলিগরি এবং গিওভ্যানি বোকাসিয়ো নামক লেখকরা মানবতাবাদ নামে একটি প্রচারধর্মী ও প্রসারমূলক নতুন আন্দোলনে নিজেদেরকে যুক্ত করেন। পরবর্তীতে এই মানবতাবাদের ব্যাপক পরিচিতি ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও দেখা যায় যা কেবল শিল্প ও সাহিত্যের সাথে শুধু ইতালিতে নয় ফরাসি ও জার্মান দার্শনিকেরা এই মানবতার শিক্ষা ও ধর্মতত্ত্ব ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হোন। জার্মান মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন ইরাসমোস ভন রটারডাম, উলরিখ ভন হুয়েন এবং জোহানেস রয়েসলাইন।

মানবতা একটি সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলন, যার মূলে রয়েছে মানুষ এবং এর ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতা তাই উৎপত্তিগত অর্থে মানবতাবাদের মূল সুর হলো মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের মঙ্গল সাধন করা। মানবতাবাদীরা পৌরাণিক চিন্তার পরিবর্তে বাস্তবজীবনের সুখ-শান্তি, ভালবাসার প্রচার করেন এবং এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষকে সৃজনশীল শক্তি-হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ তাঁর ভাগ্য দ্ধারা কখনোই নিয়ন্ত্রিত নয়। মানবতাবাদ এই সুরের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্মের বাইরে মানুষ অস্তিত্ব তুলে ধরে, মানুষের পূর্ণতার সন্ধান করে তথা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে। "কাজেই মানবতাবাদ বলতে এমন একটা দার্শনিক মতবাদ বুঝায় যা মানুষের সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।" [৩] এদিক থেকে মানবতাবাদ মানবমুখিতারই পরিচায়ক।

মানবতাবাদ যেহেতু মানুষ ও মানুষের প্রেমকে সর্বোচ্চ শিখরে স্থান দেয় তাই ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত-চিন্তায় নিযুক্ত করতে হলে মানবতাবাদের বিকল্প কিছু নেই। অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামী, অযৌক্তিক ভিত্তি দূর করে মানুষের আত্মশক্তির জয়গান করতে পারলেই আমাদের এই ঘুণে ধরা সমাজটা আলোকিত হতে পারবে। তাই বিবেককে জাগ্রত করে নৈতিক শক্তির উন্নয়ন করে কুসংস্কারমুক্ত বিশ্ব গড়তে মানবতার জয়গান করা একান্ত প্রয়োজন।

১.২ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারায় মানবতাবাদী চিন্তা

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবল ধারা মানবতাবাদের মাধ্যমে মানুষকে এক অভিনব মুক্তির আশ্বাস প্রদান করে। যে মুক্তি সকল প্রকার কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে উত্তোরণের সাথে সাথে মনুষ্যত্বের পরিপন্থী সকল রকমের বৈষম্য থেকে মুক্তির কথা বলে। এমন চিন্তা-চেতনা ধারণের ফলে পাশ্চাত্য দর্শন, সমাজ ও সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়, যার মূলে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ বিরাজ করতো। মানুষ যে তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা প্রয়োজন এবং সকল মানুষেরই যে সমাজে স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে এই বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল পাশ্চাত্য দার্শনিকদের। পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দর্শনে নৈতিকতা অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে আছে। তবে এটা ঠিক যে, গ্রিক নৈতিকতার অনুশীলন প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়েছিল সক্রেটিসের হাত ধরে। এছাড়াও গ্রিক দার্শনিকের মধ্যে পীথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস ও হিরাক্লিটাসের মতো দার্শনিকেরাও নৈতিক ভাবাদর্শের কথা বলেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের দার্শনিক ও পাশ্চাত্য দর্শনের জনক থেলিস প্রথা ও পুরাণের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রথম যুক্তি দিয়ে বস্তু জগতকে ব্যাখা করেন এবং স্বাধীন চিন্তা ও নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দর্শনের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পবিবর্তন সাধন করেন। তিনি জগৎ ব্যাখ্যায় যে নীতি ও পদ্ধতির অনুশীলন করেন তা ছিল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক।[৪] থেলিসের মতো গ্রিক দার্শনিক জেনোফিনিসও যুক্তি দিয়ে বস্তুজগতকে ব্যাখ্যা করেন এজন্য তাঁদেরকেই প্রথম গ্রিক মানবতাবাদী বলা যায়।

দর্শনের ইতিহাসে সোফিস্ট সম্প্রদায় এক প্রাণবন্ত মানবতাবাদের উদ্ভব ঘটান। সোফিস্টদের মধ্যে অন্যতম প্রোটাগোরাস মনে করেন ব্যক্তি নিজেই সবকিছুর পরিমাপক। আমার কাছে যখন যা সত্য বলে মনে হবে তাই আমার জন্য সত্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্রভাবে তাঁর নিজের বিচারালয়ের চূড়ান্ত বিচারক। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো “Man is the measure of all things; of what is, that it is! of what is not, that is is not." [৫] এ উক্তির মধ্য দিয়ে প্রোটাগোরাস বিখ্যাত হয়ে আছেন। সুতরাং দার্শনিক আলোচনাকে বাস্তবমুখী ও কার্যকর করে তুলতে সোফিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মানবতাবাদী দর্শনের মূলকথা ছিল, প্রকৃতি নয় বরং মানুষ নিজেই তার চিন্তার প্রথম ও প্রধান সমস্যা। তাঁদের এই প্রাণবন্ত মানবতাবাদী দর্শন প্রচারের মাধ্যমেই দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পরবর্তীতে উপযোগবাদ, প্রয়োগবাদ, প্রত্যক্ষবাদ ও অস্তিত্ববাদের মতো দার্শনিক আন্দোলনেও সোফিস্টদের চিন্তার প্রতিফলন ঘটে।

সক্রেটিসের দার্শনিক চিন্তার মূল বিষয় ছিল মানবজীবনের উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের করণীয় বিষয় এবং মানবজীবনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা। তিনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি বিশ্বাস করেন, নির্বিচারে বিশ্বাস ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম হলো জ্ঞান। আত্মজ্ঞান অর্জন বা নিজেকে জানাই মানুষের পরম কাম্য হওয়া উচিত। তাঁর মতে, আমাদের কি করা উচিত এবং কিভাবে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা যায় এসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ কারণেই সক্রেটিস আত্মজ্ঞানের মহান ব্রতে এবং মানব কল্যাণে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পরর্তীতে এরিস্টটলের মধ্যেও এমন মানবতার প্রতিফলন দেখা যায়।

আধুনিক যুগের দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন মনে করেন, মানুষ তার বুদ্ধিদীপ্ত মন নিয়ে লক্ষ্য করলে অতি সাধারণ বিষয় থেকেও অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। “Bacon explains how natural philosophy dominated by reason can progress from observing superficial details, through a knowledge of underlying transitory phenomena to an understanding the permanent fundamentals, . . .” [৬]

দার্শনিক জন লক জীবনচর্যায় সকলকে সমান অধিকার দানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার সীমিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে “. . . the ‘life, liberty and estate’ of one person can be limited only to make effective the equally valid claims of another person to the same rights.” [৭] তাছাড়া এ সময়ের দার্শনিক থমাস পেইনের বিভিন্ন রচনায় তাঁর গভীর মানবপ্রেমের সন্ধান মিলে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাশ্চত্যের দুটি দার্শনিক মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। একটি জেরেমি বেন্থাম ও জে.এস.মিলের প্রচারিত উপযোগবাদ অপরটি ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ। উপযোগবাদ মতবাদের মূলে রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণ সুখের কথা (The greatest good of the greatest number)। যেহেতু এই মতবাদ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণ সাধনের কথা বলে তাই এর মধ্য দিয়ে মানবতাবাদের সুরই বেজে ওঠে। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষবাদ একটা প্রাচীন মতবাদ। ভারতবর্ষে চার্বাক দর্শনে ‘যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ’ অর্থাৎ যতদিন বাঁচ, সুখেই বাঁচ এই উক্তির মধ্যেও প্রত্যক্ষবাদের সুর নিহিত। তাছাড়া, পাশ্চাত্য দর্শনে লক, হিউম, মিল ও বেনের প্রচারিত ‘অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন’ নামক দার্শনিক মতবাদও মূলত প্রত্যক্ষবাদ। এ মতবাদের মূলকথা হলো- “যা কিছু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় তাই একমাত্র সত্য-এর

বাইরে কোনো বিষয়ই আমাদের নিকট বিবেচ্য নয়।" [৮] প্রত্যক্ষণই এর মূল কথা। কোঁত মনে করেন আমাদের যাবতীয় সমস্যা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তিনি ঈশ্বর সাধনার পরিবর্তে মানবসেবার কথা বলেছেন। তাঁর নিমোক্ত উক্তিতে মানবসেবার রূপ ধর্ম পালনের ইঙ্গিতটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। "To speak first of the banner to be used in religious services. It should be painted on canvas. On one side the ground would be white; on it would be the symbol of Humanity, personified by a woman of thirty years of age bearing her son in her arms. The other side would bear the religious formula of positivists: Love is our Principle, Order is our Basis, Progress our End, upon a ground of green, The colour of hope, and therefore most suitable for emblems of the future." [৯] তাঁর মতে মানবকল্যাণ একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত। প্রত্যক্ষবাদ মতবাদের মধ্য দিয়ে মানবতার উপাসক কোঁত এই মানবসেবার আদর্শ প্রচার করেছেন এজন্যই একে মানবধর্ম বলা হয়েছে।

ফরাসী দার্শনিক রুশোর মানবতাবাদী চিন্তাচেতনা সমগ্র ইউরোপের চিন্তা জগতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। বৈষম্যপীড়িত ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট মানবসমাজে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি তাঁর লেখনী তুলে ধরেছেন। মানবসমাজের অবর্ণনীয় দুঃখ দূর করার জন্য তাঁর 'Social Contract' গ্রন্থে মানুষকে সব রকমের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শৃঙ্খল ভঙ্গ করার কথা বলেছেন। এ গ্রন্থে বলেছেন "Man is born free, and everywhere he is in chains. Many a one believes himself the master of others, and yet he is a greater slave than they, How has this change come about? I do not know. What can render it legitimate. I believe that I can settle this question." [১০] এই গ্রন্থে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন যে, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। "To renounce one's liberty is to renounce one's quality as a man, the rights and also the duties of humanity." [১১] এভাবেই তাঁর গ্রন্থে সর্ববন্ধনমুক্ত মানবতার জয়গান করা হয়েছে।

কার্ল মার্কস তাঁর গ্রন্থ 'Das Capital' এ প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মাঝে বৈষম্য দূর করে সাম্য স্থাপন করার জন্য তাঁর মতে শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্য। এভাবেই Communism (কমিউনিজম) এর আদর্শে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠন সম্ভব। তাঁর মতে কমিউনিজম এমন এক মানবতাবাদ যা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বাতিল করার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিশ শতকে অস্তিত্ববাদের মতো জীবনমুখী দর্শনের অন্যতম দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত তাঁর প্রথম দিকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক উগ্র মতবাদকে পরিবর্তন করে মানবতাবাদভিত্তিক করার চেষ্টা করেছেন। এজন্য সার্তের অস্তিত্ববাদী দর্শন আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনে হলেও আসলে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, মানবতাবাদী।[১২] আসলে অস্তিত্ববাদ মানবতাবাদী দর্শন, মানবিক, বাস্তববাদী ও জীবনমুখী হিসেবে স্থান পেয়েছে কিয়ার্কেগার্ড এর চিন্তা-চেতনায়। বিংশ শতাব্দীর শান্তিবাদী দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের চিন্তায়ও মানবতাবাদের সন্ধান মিলে, তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবতার কল্যাণেই একটি বিশ্বসরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাঁর কাছে ব্যক্তি ও মানবতার জয়গান ছিল মূখ্য এবং বাস্তবভিত্তিক চিন্তাধারার মাধ্যমে আমৃত্যু মানবতার কল্যাণের চিন্তা ও কাজ করেছেন। এভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদ বিকশিত হয়।

১.৩ প্রাচ্য মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা

কোঁত, বেন্থাম, মিল, রুশো প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মানবকল্যাণমূলক চিন্তাধারা প্রাচ্যের দর্শনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তবে প্রাচ্যে মানবতাবাদী দর্শন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের হাত ধরে। তিনি মানুষের মুক্তি কামনায় ঈশ্বরকে গুরুত্বহীন মনে করেন। জগতের সকল প্রাণীর সুখ কামনা করে জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেন। এসবের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদের রূপ ফুটে ওঠে। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের আত্মসংযম, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, মানবকল্যাণের মতো ধারণা মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরে। গৌতম বুদ্ধ মানুষকে অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে মুক্তবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন সেই সাথে মানবতাবাদের মূল বিষয় মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মানবতা এবং মুক্তবুদ্ধির মাধ্যমে মানুষের নৈতিক শক্তির বিকাশ সাধন করে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূলে রেখেছেন মানুষ ও জগৎ। এই নীতি ধারণ করে তিনি নিরীশ্বরবাদী ধর্মীয় মানবতাবাদ প্রচার করেছেন যেখানে ঈশ্বর বা অদৃষ্টের কোন স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে নীরুকুমার চাকমা বলেন- "Buddhism, therefore, replace, 'Nemesis and provindense Kismet, Destiny and Fate, with a natural law', a law that emphasizes that nothing but man himself is the moulder and the sole creator of his life to come, and master of his destiny." [১৩] সুতরাং মানবকল্যাণ কামনাই গৌতম বুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল ।

সারাবিশ্বে মুক্তিকামী মানুষের এক উজ্জ্বল প্রেরণা হলো মহাত্মা গান্ধী। আদর্শ জীবন, শিক্ষা ও মানবতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। তাঁর মানবতাবাদী দর্শনের মূলে ছিল অহিংসা, সাম্য ও স্বাধীনতা। তাঁর মানবতাবাদে গণতন্ত্রও স্থান পেয়েছিল। তিনি স্বাধীনতার সুবিচার, সাম্য, শান্তি এবং অহিংসার মাধ্যমে

একটি সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন যাতে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর এমন রাষ্ট্র গড়ার চেতনায় মানবতাবাদীর ধারণা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মানবকল্যাণব্রতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব জ্ঞান-তপস্বী ডিরোজিও। তিনি বাঙ্গালী তরুণদের মানসিক চিন্তায় মুক্তবুদ্ধির অনুশীলন করতে আগ্রহী করেছেন। মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও প্রসার ঘটিয়ে তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজকে ধর্মাচ্ছন্নতা, অধ:পতন থেকে মুক্ত করে উন্নতি সাধন করাই ছিল তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। তিনি আজীবন জ্ঞানচর্চা ও সংস্কার মূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এ প্রসঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন- "ডিরোজিওকে ভুলে যাওয়া বা উপেক্ষা করা জাতীয় জীবনে আত্মহত্যার শামিল। তিনি প্রথম আমাদের যুবসমাজের চোখে নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাবনার উত্তরসূরি হয়েই আজ আমরা সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। এই যুক্তিবাদী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদী কবি আমাদের জড়-জীবনকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রাণপাত করেছেন। . . . ডিরোজিও সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বাধীনতা কি, তা বাঙ্গালী জাতিকে শিখিয়ে গিয়েছেন।" [১৪] এই মানবহিতৈষী হিন্দু সমাজকে ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে কঠোর যুক্তিবাদ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রগতিশীল চিন্তার পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন।

এই শতাব্দীর আরেক মনীষী রামমোহনের বিভিন্ন রচনায় মানবতাবাদী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মতে সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেম এবং এই শাশ্বত বাণী তিনি প্রচার করেছেন। একটি সমুন্নত উদার ধর্মবোধকে আশ্রয় করে সকল মত ও সকল পথকে সমান শ্রদ্ধা দেখিয়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান সকলকে সমভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ গভীর ধর্মবোধই তাঁকে বিশ্বপ্রসারিত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি নারীমুক্তিরও অগ্রদূত ছিলেন, হিন্দুসমাজের নারীদেরকে সতীদাহের মতো অমানবিক প্রথা থেকে মুক্ত করতে সফল ও সাহসী ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া বাল্যাবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, কন্যা বিক্রয় এসব থেকে নারীদের মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছেন, "কোন দিনই আমি হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিনি। আমার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল কুসংস্কার ও গোঁড়ামি।" [১৫] তাঁর এসব কিছুর মূলে ছিল মানবকল্যাণমূলক চিন্তা।

রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হন অবহেলিত নারী সমাজকে মুক্তি দিতে। তিনি নারীশিক্ষা প্রচলন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং

বিধবাবিবাহ প্রচলন করেছেন। এসব কিছুর প্রেরণা পেয়েছেন মানবপ্রীতি থেকে। সার্বিক মানবকল্যাণের লক্ষ্যে অবক্ষয়প্রাপ্ত ঘূণে ধরা সমাজকে বাস্তবতার আলোকে পরিবর্তন করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য।

ঊনিশ শতক ছিল নবজাগরণের অধ্যায়, এ সময় অনেক মানবপ্রেমিকের জন্ম হয়। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র প্রমুখ অন্যতম। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের যে মূলমন্ত্র প্রচার করেন সেখানে তাঁর মানবতাবাদের সন্ধান মেলে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে সৎকর্ম ও নৈতিক মূল্যের উপর গুরুত্ব দেন। অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার মূল বিষয় ছিল মানুষ। তিনি ইহজাগতিক মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে মানুষের জাগতিক কল্যাণ কামনা করেছেন। তিনি মনে করেন সমাজের সমস্টিগত কল্যাণের মধ্য দিয়েই মানবতার পূর্ণতা পায়। বাস্তববোধ সম্পন্ন ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে বাঙ্গালী নবজাগরণে অক্ষয়কুমার দত্ত এক নতুন চেতনা যোগ করেন। এভাবে কেশবচন্দ্র সেনও সাম্যভিত্তিক ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ধর্মের পাশাপাশি সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজ নামে এক নতুন সমাজ গঠন করে সমাজ বিপ্লবের ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁর ব্রাহ্মসমাজে সকল ধর্মমতকে স্থান দেয়ায় এ ধর্ম বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। তাঁর সমন্বিত ধর্মমতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানবতার কল্যাণ সাধন করে সমাজকে প্রগতির দিকে ধাবমান রাখা।

মানবপ্রীতি ও মানবমৈত্রীর শিক্ষা বঙ্কিম সাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায়। দেশ ও জাতিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। মনুষ্যত্ববোধকে আশ্রয় করেই তাঁর দর্শন প্রচারিত হয়েছে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও রুশোকে তিনি পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ট সাম্যসংস্থাপক রূপে উপস্থাপন করেছেন। বুদ্ধের শিক্ষায় ভারতে বর্ণবৈষম্যের মূলে আঘাত পড়ে, খ্রীষ্ট প্রচারিত মানবপ্রীতির বাণীতে প্রভু ও দাস, উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের বৈষম্য-ঘুচিয়া যাইতে থাকে আর রুশোর শিক্ষাগুণে মানবসমাজে শ্রেণীবৈষম্য বিলোপের সম্ভাবনা দেখা দেয়।[১৬] বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনজন দার্শনিকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাঁর বিভিন্ন লেখায় মানবসমাজে সমতা স্থাপনের কথা বলেছেন। তাঁর এই সাম্যনীতি মানবনীতিরই পরিচায়ক। এবং এর বিকাশ দেখা যায় স্বামী বিবেকানন্দের লেখায়। শ্রেণী ব্যতিরেকে সকল মানুষকে মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত হলে মানুষ নিজেই তার সমস্যার সমাধান করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় ও সাহিত্যকর্মে মানবতাবাদের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সীমা ও অসীমের মাঝে এক সেতুবন্ধন তৈরি করে ক্ষুদ্রজীবনকে বিশ্বজীবনের সাথে মিলিত করার এক আকুতি তার সমগ্র রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। মনুষ্যত্বের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ, এই শ্রদ্ধাবোধ তাকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বমানবের দিকে প্রসারিত করেছে। তাঁর আলোচনার প্রধান বিষয় মানুষ এবং তিনি মনুষ্যত্বের জয়গান করেছেন। তাঁর কাব্য-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও পত্রে এই উদার মানবতাবাদ ছড়িয়ে আছে। তাঁর মানবতাবাদে আধ্যাত্মিকতার পরিচয় মেলে। তাঁর দর্শনে যে বিশ্বানুভূতির সন্ধান মিলে তাতে 'ব্যক্তিগত আমি'র মধ্যে 'সার্বিক আমি' বা বিশ্বচেতনা একাকার হয়ে গেছে। তিনি সর্বজনীন মানককল্যাণের পথ ধরেই পরমেশ্বরের রূপ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর চিন্তায় মানবিকতা ও বিশ্বানুভূতি একই সূত্রে গ্রথিত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্ছে বলে, আমি ঠাকুর ঘর থেকে দূরে থাকি একথা সত্য নয় মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলে আমার নালিশ।" [১৭] তাঁর দর্শনের মূল বিষয় ছিল মানুষ এবং মানবতাবাদেরই সাধনা করেছেন সারাজীবন।

প্রতীচ্যের আরো এমন বাঙ্গালী সাহিত্যপ্রেমীদের লেখায় মানবতাবাদের চিত্র ফুটে ওঠে। মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের লেখায় মানবমুখী চিন্তা-চেতনা দেখা যায় এবং সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে তাঁদের সাধনায় মানুষকে স্থান দিয়েছেন। এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিভিন্ন গান ও কবিতায় আর্তমানবতার সেবায় তথা দীনহীন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার যে আত্যন্তিক আগ্রহ দেখা যায় তা সাম্য ও মানবতাবাদের পরিচয় বহন করে। মহিলা কবি মানকুমারী বসু ও কামিনী রায় মানবতার কথা বলেছেন। 'সকলের তরে সকলে আমরা' বলে কামিনী রায় মূলত মানবতাবাদের মূলমন্ত্রই প্রচার করেছেন।

মানুষের মুক্ত বুদ্ধি ও বিচারমূলক চিন্তনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এক অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী কবি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, তাঁর দর্শনের মূল বিষয় ছিল মানুষের কল্যাণ। তিনি সকল প্রকার কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা এবং শোষণের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গল্প, কবিতা, উপন্যাসের কোথাও ধর্মীয় সংকীর্ণতা, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। মানুষের মর্যাদা ও দায়িত্ববোধকে সবার উপরে স্থান দিয়ে তিনি নারীপুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মানবতাবাদ রচিত হয়েছে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও মেহনতি মানুষের পক্ষে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কসবাদের বিকাশ ঘটে এবং ড. মানবেন্দ্রনাথ রায় এ মত দ্বারা প্রভাবিত হন। যদিও পরর্তীতে তিনি নব্য মানবতাবাদী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেন। তাছাড়া বাংলাদেশে সমন্বয়বাদী মানবতাবাদের প্রধান প্রচারক হলেন ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। মূলত তিনি ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়ে যে সমন্বয়ী ভাববাদের গোড়াপত্তন করেন তার মূলে ছিল মানুষ। সকল মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের কল্যাণের মাধ্যমে কিভাবে বিশ্বমানব কল্যাণমূলক দর্শন গড়া যায় সেটাই ছিল তাঁর দর্শন তথা সমন্বয়ী ভাববাদের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আরজ আলী মাতুব্বর, আবুল হাশিম, প্রবোধ চন্দ্র সেনের মতো চিন্তাবিদদের চিন্তাধারায় মানবতাবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১.৪ বিশ্ব ধর্মতত্ত্বে মানবতাবাদ

ধর্ম মানবজাতির জন্য যা কিছু কল্যাণকর, মঙ্গলময় তার সবকিছু ধারণ করে। মানুষের তথা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করাই ধর্মের উদ্দেশ্য। দিকভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন মানবজাতিকে সুপথে আননয়ের জন্য এবং তাঁদের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে দূত পাঠিয়েছেন। বিশ্বে ধর্মতত্ত্বে যেসব ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে এর মধ্যে শামান, কনফুসিয়াস, শিন্টো, তাও, বৌদ্ধ, হিন্দু, পারসিক, বাহাই, শিখ, ইহুদী, খ্রিষ্ট ও ইসলাম ধর্ম অন্যতম। এসব ধর্মের বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায় ভিন্ন হওয়ার কারণে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। তবে প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে কনফুসিয়াসের ধর্মদর্শনে অলৌকিকত্বের কোন স্থান ছিলনা। মানবতাই ছিল এ দর্শনের কেন্দ্র বিন্দু, মানুষকে ভালবাসো এ ছিল তাঁর নির্দেশ। আবার, তাওবাদের নীতিমালাতে দেখতে পাই, সর্বজীবে দয়া, দরিদ্রদের জন্য ত্যাগ, কল্যাণবৃদ্ধি এসব রয়েছে যা মানবতারই নির্দশন।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস অহিংসার ইতিহাস, সাম্য ও মৈত্রীর ইতিহাস, সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা বৌদ্ধ ধর্মের আবশ্যকীয় দিক এবং যে ধর্মে বিশ্বাসী হোক না কেন তাকে শ্রদ্ধা করার নির্দেশ রয়েছে বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মে। ধর্মের নামে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া, জোর পূর্বক ধর্মান্তর করা, অবৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন এসব দৃষ্টান্ত গৌতম বুদ্ধের ধর্মে নেই। তিনি বলেছেন হিংসার দ্বারা হিংসা কমেনা, একমাত্র প্রেমের দ্বারাই সম্ভব। বৌদ্ধ ধর্মে প্রেম বা মৈত্রীকে ব্যাপক অর্থে বুঝানো হয় যা শুধু মানবপ্রেম নয় বরং সর্বজীবে দয়া ও করুণাকেও নির্দেশ করে।

হিন্দু ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও বিশ্বপ্রেম। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "নারায়ণ বা ভগবান দরিদ্রের মধ্যে বিরাজ করেন, তাই দরিদ্রের সেবার মাধ্যমে নারায়ণের সেবা সম্ভব।" [১৮] রামানুজ কাজে-কর্মে ভক্তি ও প্রেমের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত দ্বারা জগতের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেন যা গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ নামেও পরিচিত। তিনি জীবে প্রেমকে বিশ্বপ্রেমেরই সমতূল্য মনে করেন এবং হিন্দুধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবতার কল্যাণে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

এভাবে প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর ন্যায় ইসলাম ধর্মেও বিশ্বাস করা হয় ইসলামই মানবতাকে যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারে। বিপ্লবী আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কেবল ইসলামেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত আছে। ইসলাম জাতীয় ও আঞ্চলিক মুক্তির কথা বলে তাই এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন মতাদর্শ এবং মানবতার মুক্তির পথ ও উপায় নির্দেশ করে। মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা করে। এ সমতার অর্থ হলো মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী মর্যাদা পাবে।

সত্যিকার অর্থে প্রতিটি ধর্ম মানুষের কল্যাণের কথা বলে, মানবতার মুক্তির কথা বলে। বিশ্ব ধর্মতত্ত্বের মানবতাবাদ তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন মানুষ ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে মানুষের কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করবে। মানবতার স্বরূপ তখনই ফুটে উঠবে যখন মানুষ অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী এসব সংকীর্ণতা ত্যাগ করে মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসবে আর তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে সুন্দর, সুস্থ ও সত্যিকারের সমাজ। বিশ্ব ধর্মতত্ত্বে যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তার জন্য প্রয়োজন মানবপ্রেম তাহলেই পৃথিবীটা হয়ে উঠবে বাসউপযোগী।

সুতরাং মানবজীবনের সকল বিষয়ের মধ্যে মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মানবতাবাদ মতবাদটি বর্তমানে বহুল আলোচিত। যিনি মানুষের কল্যাণে সবকিছু ত্যাগ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত মানবতাবাদী। মানুষের পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে এ বিশ্বের নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন সময় মানবতাবাদের ধারণার বিকাশ হলেও এর মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ ও মানুষের কল্যাণ। আর মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন মানবপ্রেম, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নির্বাচন করার ক্ষমতা। এসবের মধ্যে দিয়ে বিশ্বে প্রকৃত মানবতাবাদ গড়ে ওঠে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। বিনয় ঘোষ (১৯৭৬), *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লঙম্যান, পৃ. ৩৭২

২। ড. আমিনুল ইসলাম (১৯৯৬), *পাশ্চাত্য দর্শন: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী, পৃ. ৬৪

৩। মো: আবদুল হাই তালুকদার (১৯৯৯), 'ঊনিশ শতকে বাংলায় মানবতাবাদ চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড', শরীফ হারুন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৮৩

৪। ড. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫। W.T. Stace (1972), *A Critical History of Greek Philosophy*, Macmillan, St. Martins Press, P.112

৬. S.H. Steinberg (1953), Cassell's *Encyclopaedia of Literature*, Vol. 1, London, Cassell & Company Ltd., P. 6

৭. George H. Sabine (1951), *A History of Political Theory*, London, Oxford and IBH Publishers, P. 447

৮। বিপিনচন্দ্র পাল (১১৬৪), *নবযুগের বাংলা*, ২য় সং, ভারত, চিরায়ত প্রকাশন, পৃ. ৫৮-৫৯

৯. Auguste Comte (1957), *A General view of Positivism*, New York, Cambridge University Press, P. 431

১০. J. J. Rousseau (1948), *The Social Contract*, tr. By Henry J. Tozer, London, Swan Sonnenschein & Co., P. 100

১১. Ibid. P.105

১২. নীরু কুমার চাকমা (১৯৯৭), *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৮৫

১৩। N. K. Chakma (2007), *Buddhism in Bangladesh and other Papers*, Dhaka, Abosar, P.16

১৪। ড. আমিনুল ইসলাম (২০০২), *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১১৫

১৫। তেসলিম চৌধুরী (২০১১), *ভারতের ইতিহাস- আধুনিক যুগ (১৭০৭-১৯৬৪)*, কলকাতা, মিত্রম পৃ. ৮২

১৬। রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত (১৯৮২), *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সাম্য চিন্তা*, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রাককথন, পৃ. ১৩

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৭), *চিঠিপত্র-৯*, পত্র সংখ্যা-২, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ৪

১৮। মো: আবদুল ওদুদ (২০১১), *ধর্মদর্শন*, ঢাকা, মনন পাবলিকেশন, পৃ. ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলায় মানবতাবাদ

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলায় মানবতাবাদ

মানবসত্তার প্রতি উদার ও মঙ্গলকামী হওয়াই মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য। মানবতাবাদ প্রকৃতপক্ষে একটা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, এটা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্যায়ন করে, মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে সর্বোপরি মানুষকে মানবিকসম্পন্ন হওয়ার কথা বলে। মানবতাবাদে মানব কল্যাণকে সমর্থন করে ধর্মীয় প্রভাবকে অস্বীকার করা হয় এবং মানবতাবাদে ধর্ম, নৈতিকতা ও দর্শন একই সূত্রে গ্রথিত থাকে। বিভিন্ন যুগে বাঙালির দর্শনে মানবতাবাদ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালির দর্শনে যেমন অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রভাব রয়েছে তেমনই মানবতাবাদেরও প্রভাব রয়েছে। এই মানবতাবাদ কখনো সেকুলার অর্থে আবার কখনো নন-সেকুলার অর্থে প্রকাশ পেয়েছে।

২.১ প্রাচীন যুগের বাংলায় মানবতাবাদ

প্রাচীন বাংলার লোকায়ত দর্শন ছিল জড়বাদী। প্রত্যক্ষণ ছাড়া এ দর্শন কোনকিছুর অস্বিত্ব স্বীকার করেনা। লোকায়ত দার্শনিকরা ছিলেন স্থূল সুখবাদী। তাঁদের মতে-"সম্পদ এর ভোগ মানুষের অস্তিত্বের মূলবস্তু, এ জগতের বাইরে কোন জগৎ নেই, মৃত্যুতেই সবকিছুর পরিসমাপ্তি।" [১] ইন্দ্রিয়সুখকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যই তাঁদেরকে জড়বাদী বা সেকুলার মানবতাবাদী বলা হয়।

বাঙালীর সাহিত্য-চিন্তায় প্রথম থেকেই সাম্যবোধের আভাস পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদগুলোত বাঙালীর সাম্যচেতনায় কিছুটা বিক্ষিপ্ত পরিচয় মিলবে। চর্যার গানগুলোর ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্গণ সহজধর্মের সাধনতত্ত্ব ও সাধনরীতির ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। সাধারণের নিকট তাঁদের এই গূঢ়ার্থবহ ধর্মমত তুলে ধরার জন্য তাঁদেরকে বহুস্থলেই রূপকের আশ্রয় নিতে হয়েছে।[২] চর্যার ছন্দ ও অলংকারের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মানবতাবোধের মহৎ ধারা প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি কোনো কোনো গবেষক দেখাতে চেয়েছেন, "শ্রেণিদ্বন্দ্ব, ধনীক ও গরিবের সংঘর্ষ, উচ্চজাতি ও নিম্নজাতির বিরোধ ইত্যাদিই চর্যাপদের মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা এবং শোষণ-শাসন, অন্যায়-অবিচার, ক্রোধ, জিঘাংসা, বিক্ষোভ এইসব থেকে মুক্ত হবার আদি বাংলার জনমানবের দিগদর্শনই চর্যাপদে প্রছন্ন।" [৩]

চর্যার মানবতাবোধ ফুটে ওঠে তখনকার গ্রামীণ জীবনযাত্রায়। প্রাচীন বাংলার মানুষের দুঃখদুর্দশা, দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতিহীন সমাজ বিন্যাসের কারণ হিসেবে বর্ণাশ্রমকে দায়ী করা হয়। এই বর্ণাশ্রম আর্যসমাজের হিন্দু ধর্মানুশীলনকারী, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের জীবন ও সমাজের

ভিত্তি ছিল। চর্যার কবিরা সহজ সাধনার মাধমে অবহেলিত ও নিস্পেষিত মানবতাকে জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁরা মনে করতেন, মানুষের মধ্যেই পরম শান্তি, মানবাত্মাতেই বিশ্বাত্মার বিকাশ ঘটে। মহাভারতে আছে,

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি।

ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।।

ভীষ্ম যুধিষ্টিরকে বললেন, গুহ্য একটি তত্ত্ব তোমাকে বলছি, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নেই। অর্থাৎ মহাভারতে মানুষকে সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

অহিংসার ধারকরূপে গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের কথা বলেননি, 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক' এ নীতিতে বিশ্বাস করে ধর্মীয় মানবতা প্রচার করেছেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়া। মানুষ সংসারে বাস করে যে শোক, তাপ, জরা ও মৃত্যু যন্ত্রনা সহ্য করে সেই দুঃখ থেকে মুক্তির সন্ধান করেছেন তিনি। দুঃখকে স্বীকার করে কতগুলো নৈতিক সূত্র দিয়ে দুঃখ অতিক্রম করার পথ নির্দেশ করেছেন যেগুলো অষ্টাঙ্গিক মার্গ হিসেবে পরিচিত। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতা প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য গৌতম বুদ্ধের এই ধর্মকে মানবতাবাদের প্রেম ও ভক্তি রূপ বলা হয়।

প্রাচীন বাংলায় পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তবে এই ধর্মে লোকসেবা বা মানুষের প্রতি প্রেমই লক্ষণ ছিলনা, পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মে সহজিয়া সাধনা বুদ্ধকে রূপান্তরিত করেছিল। এই সহজিয়া বাঙালির জীবনের মর্মমূলে থেকে তার চরিত্র এবং সংস্কৃতিকে দিয়েছিল এক বিশিষ্ট রূপ। বৈদিক সংস্কৃতি থেকে সহজিয়া সংস্কৃতি ভিন্ন। সহজের সাধনা ছিল এখানে এবং আচার-বিচারের তেমন জটিলতা ছিলনা, তেমনই ছিলনা দেহতাতীত ব্রাহ্মসাক্ষাৎকারের জটিলতা। সম্ভবত সহজিয়াকে কোনো ধর্মই বলা উচিত নয়। সহজিয়া একটি জীবন প্রকৃতি বা দৃষ্টিভঙ্গি। এর অর্থ যা সহজগম্য প্রত্যক্ষ তাকেই সত্যস্বরূপ অবলম্বন করা।[৪] আসলে মানুষের জীবন ও মানব অস্তিত্বের চেয়ে বড় কিছু নেই। আর যে ধর্মে মানবজীবন ও মানবদেহের পূর্ণতার কথা নেই সে ধর্মের সাথে সহজিয়া ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এই আদি ধর্মই বাঙালির প্রকৃতিকে গড়ে তুলেছে। ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "বাংলাদেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা। প্রেমই হলো ধর্মের প্রাণ। এই সব কথাই বৌদ্ধযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমানভাবে দেখা যাচ্ছে এই সব কথাই বাংলার যোগমতে, বাংলার তান্ত্রিক সাধনায়, বাংলার প্রাকৃত

গানে চলে আসছে। বাংলাদশের সাধনায় এইটেই প্রাণবস্তু।" [৫] প্রাচীন বাংলায় এভাবেই মানবতাবাদের চিত্র ফুটে ওঠে।

২.২ মধ্য যুগের বাংলায় মানবতাবাদ

বাঙালির ধর্মে মানবিকতারই প্রাধান্য দেখা যায়। প্রাচীন বাংলার চর্যার আধ্যাত্মিক মানবপ্রেমের অভিব্যক্তি পরবর্তীতে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, বাউলতত্ত্ব ও সুফী সাধনায় প্রতিফলিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি কৃত্তিবাস ওঝার বাঙলা অনুবাদ-কাব্য 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' এও মানবতাবাদী মনোভাব ফুটে ওঠে। বাঙালির জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তিনি এখানে মানবতার কথা বলেছেন। সে যুগের বর্ণভেদ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেছেন এবং ক্ষত্রিয় ও চণ্ডালের মধ্যে মিত্রতার কাহিনী সন্নিবেশ করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

মঙ্গলকাব্য এ যুগে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। দেবতাদের মহিমা প্রচারের জন্যই মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাঁদের কাব্য রচনা করেন এবং মানবতা এখানে স্থান পেয়েছে। মঙ্গলকাব্যের ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে ধনী-গরিবের পার্থক্য ঘুচিয়ে একটা সমতার আদর্শে সমাজ গঠনের প্রয়াস রয়েছে। সমাজের উঁচু-নীচু প্রভেদ ভুলে সকল মানুষের প্রতি প্রেমপ্রীতিস্নিগ্ধ একটা সমদৃষ্টির ভাব মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অনেক প্রাচীন বলে খ্যাত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বিষয়বস্তু হলো মনসাদেবীর পূজা প্রচার এবং তাঁর মাহাত্ম্যের প্রশংসা করা। 'মনসামঙ্গল' কাব্য মূলত দেবচরিত্র 'মনসা' কে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে রচিত, এখানে কবির মানবপ্রেম বারবার দেবী মনসার নির্মমতাকে নির্ভয়ে অনাবৃত করেছে। এই কাব্যে চাঁদ সওদাগর প্রধান চরিত্র এবং তার হাতের পূজা ব্যতীত মর্ত্যধামে মনসাদেবীর পূজা প্রচার করা যাবেনা। তাই দেবী মনসা বিভিন্ন কৌশলে চাঁদের কাছে পূজা আদায় করে নেন। এই কাব্যে চাঁদ সওদাগর ছাড়াও আরো নিম্নবর্ণের চরিত্র রয়েছে যাদের মধ্যে সমদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায় এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব ফুটে ওঠে যা মানবতারই বহিঃপ্রকাশ।

মনসামঙ্গল কাব্য ব্যতীতও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালি কবির বৈষম্যহীন মানবতাবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যানে অনার্য ব্যাধের দ্বারা চণ্ডীদেবীর পূজার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে এসব উপাখ্যানে কোনো স্বাধীনতা ছিলনা। কিন্তু অকপটে আন্তরিকতার সাথে তাঁরা ব্যাধ জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে বুঝা যায় মানবশ্রেণীকে তারা প্রেমের চোখেই দেখতেন। মুকুন্দুরামের চন্ডীমঙ্গলে এই প্রেমের সাথে একটা গভীর সহানুভূতিও মিলিত

হয়েছে। মধ্যযুগীয় বাঙালি কবি যখনই এই মানবিক অনুভূতির স্তরে দাঁড়িয়ে কাব্য রচনা করেছেন তখন তাঁরা শ্রেণী বৈষম্যের উর্ধ্বে চলে গেছেন। মুসলমানের ধর্মনিষ্ঠাকে কবি মুকুন্দুরাম গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে লিখেছে,

" বড়ই দানিসবন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।"

হিন্দু রচিত কাব্যে মুসলমানের এই অপক্ষপাত ও সহৃদয় চিত্রণ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।[৬] নির্যাতিত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা ছিল। সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর যে দরদ তা মানবতাবাদের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার কথাই বলে।

মুকুন্দুরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মতো ঘনরাম, রূপরাম প্রভৃতি কবিদের রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যেও মানবতার পরিচয় মেলে। লৌকিক দেবতাকে নিয়ে কাব্য রচনা করতে গিয়ে পুরাণ বর্ণিত কাহিনীর আশ্রয় নেয়ার কৌশল তাঁরা অবলম্বন করেছেন এবং এর মাধ্যমে মধ্যযুগে বাঙালি কবির সমন্বয়ী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে শুধু লৌকিক ও পৌরাণিক আদর্শের সমন্বয়ের চেষ্টাই হয়েছে তা নয় এর সাথে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দানের কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া গৌড়েশ্বরের প্রসাদপুষ্ট সামন্তরাজপুত্র মহাবীর লাউসেনের সাথে অস্পৃশ্য কালু ডোমের সম্প্রীতি স্থাপনের চিত্র তুলে ধরে ধর্মমঙ্গলের কবিরা সাম্যদর্শী মানবধর্মের নজীর তুলে ধরেছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলো এভাবে মানবমৈত্রীর বাণী প্রচার করে মধ্যযুগীয় ভেদাভেদের সমাজকে সুস্থ ও সবলভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। বাঙালির আন্তর সত্তা দুর্দিনে যখন সাম্য ও মানবতার কামনা করছিল এ সময় এক মহামানবের আবির্ভাব হলো। তাঁর প্রচারিত মানবপ্রেমের মাধ্যমে বাঙালি নতুন জীবন লাভ করলো। সেই মহামানব চৈতন্যদেব যে ধর্ম প্রচার করলেন, সে ধর্মের বৈশিষ্ট্য হলো ঈশ্বরকে মানুষের মধ্যে দেখা। তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে, তাঁর মানবপ্রেমমূলক শিক্ষায় বাঙালি সমাজজীবন থেকে সকল প্রকার বৈষম্যের অভিশাপ ঘুচে গেল- বিশ্বব্যাপী প্রেমের জাদুস্পর্শে বাঙালির অভিনব 'চিত্তবিস্ফোরণ' ঘটলো। সকল মানুষের মধ্যেই ভাগবত সত্তা রয়েছে, মানুষ ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ নয় সকল মানুষ সমান এমন চিন্তাই শ্রীচৈতন্যের জীবন দর্শনে প্রকাশিত হয়েছে। নিখিল মানবের সাথে এই একাত্মবোধ তিনি প্রকাশ করেছেন। সকলের মধ্যে তিনি যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন এটাই তাঁকে সর্বকালের মহামানব হিসেবে উন্নীত করে। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা না করলেও তাঁর জীবনদর্শনই ছিল তাঁর বাণী। তাঁর এই অলিখিত বাণী বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে যে মানবপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করেছে তা যুগ যুগ ধরে মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' মতো রাধা ও কৃষ্ণের অনুরাগমূলক কাব্য আর রচিত হয়নি। এখানে কাব্য রসের তুলনায় ভক্তিরসের প্রাধান্য দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই ছিল এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। জয়দেব যখন জনপ্রিয় ছিলেন ঠিক সেসময় বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। হিন্দু সমাজের উদারতায় কুসংস্কার গ্রাস করায় বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত ছিল। এমন সংকটময় মুহূর্তে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী দর্শনের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন জয়দেব। তিনি সাম্য, মৈত্রী, উদারতা ও মানবতার বাণী প্রচারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংকীর্ণতা ও কঠোরতাকে দূরে ঠেলে দিলেন এবং প্রচার করলেন এক জীবনমুখী দর্শন: তাঁর দর্শন ছিল যেহেতু অসাম্প্রদায়িক ও মানবধর্মের প্রতি আগ্রহশীল তাই তিনি সমন্বয়ী জীবনদর্শনে বিশ্বাস করতেন। সেই দর্শনের ভিত্তিতেই তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আভিজাত্যময় জীবনকল্পের সঙ্গে সমন্বিত করতে চাইলেন লোকজীবন ভিত্তিক ও হৃদয়ানুকল্য প্রধান মানব স্বভাবকে, হরি স্মরণাকাঙ্ক্ষার পরাতাত্ত্বিক আকুতির সঙ্গে পরিণয়বদ্ধ করলেন সহজ সরল লোকায়ত জীবন-ভাবনা ও বাসনাকে।[৭] জয়দেবের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলা ভাষার ঐতিহ্যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও বাংলাদেশের কবি চণ্ডিদাস উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। বিদ্যাপতি বাঙালি না হলেও চণ্ডিদাসের মতো তাঁর চিন্তায় জগৎ ও জীবনের তত্ত্ববিষয়ক অনেক নিগুঢ় কথা সংঘবদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতির ঐক্য ও মিলনে সাহায্য করেছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙালিকে মুগ্ধ করেছিল এবং চণ্ডিদাসের পদাবলী বাঙালিকে মানসিক প্রশান্তি দিয়েছিল। তাঁদের কাব্যে প্রেম ও ঐক্যের উদাত্ত আহবান ছিল। বাঙালির জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। চণ্ডিদাস তাঁর কাব্যে প্রেম ও ঐক্যের উদাত্ত আহ্বানের মাধ্যমে যে মন্ত্র প্রচার করেছেন তা হলো 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এবং এ মন্ত্রই বাঙালির দর্শনে মানবতাবাদী চিন্তার ভিত্তি রচনা করেছে এবং যুগে যুগে তা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। চণ্ডিদাসের এ উক্তি থেকে মানবতার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সংস্কারক ও চিন্তাবিদ যেমন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এদের চিন্তায় তা পূর্ণতা পেয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলায় বৈষ্ণব দর্শনে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক হলো প্রেমের বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব শুধু অতীন্দ্রিয় জগতেই নয় এই সুবিশাল বিশ্বজগতেও বিস্তৃত ছিল। বৈষ্ণব দর্শনে জাতিতে-জাতিতে, বর্ণে-বর্ণে কোন ভেদাভেদ স্বীকার করা হয় না। এজন্যই বৈষ্ণব দর্শনের দার্শনিক মতবাদ 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব'এ স্রষ্টা ও সৃষ্টি প্রেমের মিলনে কিভাবে এক হয়ে যায় তা বলা হয়েছে। এ প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি যেহেতু এক হয়ে যায় সুতরাং এদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনা এবং এখানে মানুষে মানুষেও কোন

পার্থক্য থাকেনা। বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমের যে বাণী বিশ্বমাঝারে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তা তৎকালীন সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। চৈতন্যদেব তাঁর জীবনদর্শনে জাতিগত সংকীর্ণতা দূর করে প্রেমের যে বাণী প্রচার করেছেন তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে ড.ননীগোপাল গোস্বামী বলেছেন, "এই মহাপ্রভুর প্রভাবেই জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ এক নতুন ধর্মে গড়িয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ শুদ্রের ভেদ ভুলিয়াছে, শ্রীচৈতন্য স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, সকল বিভিন্নতা দূর করিয়া এক অখণ্ড মানবজাতি গড়িয়া তুলিতে পারিলে তবেই হইবে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ এবং সেই সমাজের জন্য যাহা কিছু করা হইবে, তাহা হইবে সেই অখণ্ড জাতিরই মঙ্গল-সাধন।" [৮]

চৈতন্যদেব প্রেম ও সাম্যের বাণীর মাধ্যমে প্রচার করেছেন জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি। তিনি সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে সকলকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে প্রেমবোধ জাগ্রত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য এবং তাঁর প্রচারিত প্রেমধর্ম অবলম্বন করে রচিত হয়েছে ভক্তি কাব্য ও জীবনী সাহিত্য। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যেই রক্ত-মাংসের মানুষ সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে একক প্রসঙ্গ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।[৯] সুতরাং বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের উপজীব্য বিষয় হলো মানুষ, মানবিকতা ও মানবতাবাদের বিকাশ সাধন করা।

মধ্যযুগের মানবতাবাদী দর্শনের মধ্যে সুফীবাদ অন্যতম দার্শনিক মতবাদ। তবে বাংলায় কখন সুফীবাদের আগমন ঘটে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ধারণা করা হয়, মুসলমানদের বাংলা জয়ের পূর্বেই আরব বণিকদের সাথে সুফীদের আগমন ঘটে। বাংলায় সুফী দর্শন প্রচার কালকে মোটামুটি ৩ পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়: মুসলিম বিজয়ের পূর্বকাল: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়: মুসলিম বিজয়ের পর থেকে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের কাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১২০৪ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তৃতীয় পর্যায়: ১২৫৮ সাল থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত।[১০]

আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে বাংলায় সুফীরা আসেন। উল্লেখযোগ্য সুফীর মধ্যে সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী, হযরত শাহজালাল ইয়ামনী, শাহ জামাল, শাহ আমানত ইত্যাদি অন্যতম। এসব সুফীদের আধ্যাত্মিক প্রভাব বাংলার জনগোষ্ঠীকে সাম্য ও শান্তির কথা প্রচারের মাধ্যমে তৎকালীন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছিল। এসব হিন্দুরা এবং বৌদ্ধরা নানাভাবে সেন রাজাদের নির্যাতনের শিকার ছিল। বঞ্চিত, লাঞ্চিত, শোষিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা সুফীদের সাম্য ও মৈত্রীতে

মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে এসব শ্রেণীর মানুষেরা তাদের মর্যাদা ফিরে পায়। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে সুফীবাদ মধ্যযুগের বাংলার দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। সুফী সাধনার একটা গুরত্বপূর্ণ দিক হলো হৃদয়কে পবিত্র রেখে আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া। সুতরাং, সুফী সাধনার মৌলিক উপাদান হলো প্রেম ও ভক্তি। শান্তি ও মানবতার ধর্ম হিসেবে সুফীরা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলায় যেসব মানবতাবাদী দর্শন বিকাশ লাভ করেছে এর মধ্যে বাউলবাদ অন্যতম এবং এটি প্রেমাত্মক দর্শন। বাউল দর্শনের মূলকথা হলো, প্রেমই মানুষের সর্বশ্রেষ্ট সম্পদ, প্রেমেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। বাউলরা মানুষে মানুষ কোন পার্থক্য করেনা। কোন শাস্ত্রের মধ্যেও মানুষকে সীমাবদ্ধ করেনা। এজন্য বাউলদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য আবার মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য। এভাবেই তারা ধর্মনিরপেক্ষ অখণ্ড মানবতাবাদ প্রচার করে। সর্বজনীন ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বই তাদের মূলমন্ত্র। বাউলদের মতে মানুষে মানুষে পার্থক্য নেই, সব মানুষ সমান। মানুষই মানুষের মুক্তিদাতা, কোন ঈশ্বর বা দেবদেবীর কাছে তারা মুক্তির পথ সন্ধান করেননি। তবে অধিকাংশ বাউলই ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ এবং তাদের নিকট ধর্মের চেয়ে মানুষ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বাউলদের মানবদরদী দিকটির এক দার্শনিক তাৎপর্য রয়েছে এবং বর্তমানে যা সেকুলার হিউম্যানিজম তা বাউল দর্শনে পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে।

লালন শাহ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাউল দার্শনিক। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। মানুষের মধ্যেই তিনি পরমাত্মার সন্ধান করেছেন। ঈশ্বর বা আল্লাহ বলে আমরা যা কিছু মানি তা মানুষের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়ে থাকে। সমাজের বর্ণবৈষম্য তিনি দূর করতে চেয়েছেন। লালন তার সময়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সকল গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে মানবতার আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। আত্মজ্ঞান অর্জনের মাধমে পরমসত্তার সন্ধান করেছেন তিনি। মানুষই তাঁর কাছে মূল্যবান আবার তিনি বলেছেন 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' তাঁর এ চিন্তার মূলে বয়েছে বস্তুবাদ। বস্তুবাদী দর্শনে মনে করা হয় মানুষ নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা। লালন স্পষ্টই বলেন, "লালন ভবে বস্তুভিখারী।" [১১]
এর অর্থ হলো যা দেখা যায়, যা সত্য-যথার্থ, যা প্রকৃতই ঘটে। তিনি প্রশ্ন করেন:

" যে দেখেছে বর্তমানে
অনুমানে সে মানবে কেন?
আপন হাতে জন্ম মৃত্যু হয়
খোদার হাতে হায়াৎ মউৎ কে কয় ?" [১২]

লালনের মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা ইহজাগতিক কেন্দ্রিক। মানবতার লক্ষ্যে তিনি যুক্তি-বিচার ও মুক্ত বিবেকের দ্বারা নিজস্বমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এজন্য তিনি মানবতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে বিশ্ব সমাজের মহান আদর্শ হয়ে আছেন।

জাতি হিসেবে বাঙালি সংকর বলে প্রাচীন যুগ থেকেই বিভিন্ন দর্শন ও চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এসব অঞ্চলের মানুষ। বিভিন্ন গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা বিকশিত হয়েছে। যুগের প্রেক্ষাপটে বাংলায় পরিচিতি লাভ করে অস্তিত্ববাদ, প্রয়োগবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, মার্কসবাদ, বিশ্লেষণী দর্শন ও মানবতাবাদের মতো বিভিন্ন মতবাদ। প্রাচীনকালের বাংলায় লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের উদ্ভব ঘটে। প্রাক-ঐতিহাসিক ও প্রাচীন বাংলার মানুষ ছিল জড়বাদী। অর্থাৎ এরা জড়বাদী মানবতাবাদের সমর্থক। তবে এদের একটা অংশ অধ্যাত্মবাদী এবং এরা ধর্মীয় মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে। প্রাচীন বাংলায় ইহজাগতিক ও পারলৌকিক মানবতাবাদ নামক দুই ধরনের মানবতাবাদের প্রসার দেখা যায়। ইহজাগতিক মানবতাবাদের উৎস ছিল জড়বাদী তথা চার্বাক দর্শন। অন্যদিকে পারলৌকিক মানবতাবাদের পিছনে বিভিন্ন ধর্মীয় মানবতাবাদ কাজ করে। অর্থাৎ বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মেও ধর্মীয় মানবতাবাদের মতো মতবাদ বিকশিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় সুফিবাদ, বাউলবাদ, বৈষ্ণব দর্শন এসব মতবাদে মানবতাবাদের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখতে পাই। এদেশের কবি, সুফি, বৈষ্ণব, আউল-বাউল, ঈশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী সকলেই মানবতার উপর জোর দিয়েছেন।

তথ্য নির্দেশিকা

১। Radhakrishnan (1923), *Indian Philosophy (Vol I and II),* London, George Allen and Unwin Ltd., P. 274-279

২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৬৪), *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, ভারত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ. ১০৬

৩। অতীন্দ্র মজুমদার (১৯৭৩), *চর্যাপদ*, ঢাকা, বুকল্যান্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৬৬

৪। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *'সহজিয়া'*, ভারতকোষ ৫

৫। ক্ষিতিমোহন সেন (১৩৬০), *বাংলার সাধনা*, ভারত, বাঙলায়ন, পৃ. ২৮

৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) (১৯৫২) *'কবিকঙ্কন-চণ্ডী'*: ভূমিকা।

৭। ড. আমিনুল ইসলাম (২০১১), *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৬৭

৮। ড. ননীগোপাল গোস্বামী (১৩৭৯), *চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়িয় বৈষ্ণব*, কলিকাতা, পৃ. ২০৫

৯। মাহবুবুল আলম (২০০০), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, পৃ. ১৪৮

১০। প্রফেসর ড. রামদুলাল রায় (২০১৩), *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিকাল*, ঢাকা, উপমা প্রকাশন, পৃ. ১৯৮-১৯৯

১১। আবদুল ওয়াহাব (২০১৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর), *লালনের সমাজ ভাবনা: বিশ্বজনীনতা ও সমগ্রতার বোধ শীর্ষক প্রবন্ধ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, পৃ. ১৫৭

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র দর্শন পরিচয়

রবীন্দ্র দর্শন পরিচয়

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ একাধারে একজন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, শিক্ষা-সংস্কারক, সমাজসেবী এবং একজন সম্পাদক। কিন্তু এত সব গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্যতম পরিচয় হলো তিনি সত্যিকার অর্থে একজন মানবতাবাদী দার্শনিক। তিনি সমগ্র বিশ্বের, তাঁর লেখনীর আবেদন বিশ্বব্যাপী। তাঁর দর্শন ও মনন, জীবনবোধ, জীবনোপলব্ধি, জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবনের গভীরতা এসব কিছুর পরিচয় মেলে তাঁর সমস্ত লেখনীতে।

দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণা ও ভাব-কল্পনার মূলে রয়েছে দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের পথ। যুক্তি সংস্কারের মধ্যে বিরোধ হলে তিনি বুদ্ধিকে ব্যবহার করেছেন। দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের পথকে তিনি প্রকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন। তাঁর যুক্তির কষ্ঠিপাথরে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় চিন্তার উন্মেষের ক্ষেত্রে, বিকাশের ক্ষেত্রে। তিনি বৈশ্বিকদৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখতে চেয়েছেন, মানুষের জন্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্রদর্শন বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, ধর্মদর্শন, শিক্ষা দর্শন, সমাজ দর্শন, মরমীবাদ, নারী স্বাধীনতা, ঈশ্বরচেতনা ও মানবতাবাদ এসব বিষয়গুলোও জানা প্রয়োজন। রবীন্দ্র দর্শন ও মননে যে চিন্তা চেতনা, যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে এসব বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে।

৩.১ দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ

দার্শনিক শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও ব্যাপক অর্থে অপ্রাকৃত এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী উপলব্ধি করেন এবং সেই আলোকে পরমার্থ ও তার নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্টীয় জীবনের সকল মূলসূত্র তুলে ধরেন যিনি, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক মনীষী। তাঁর দর্শনের আবেদন বিশ্বব্যাপী। তাঁর লেখনী বিশেষ করে 'সাধনা', 'মানুষের ধর্ম', ' Personality' `Religion of Man' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থে তাঁর ক্ষুর ধারালো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর লেখনীতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রদর্শন মূলত মানবভিত্তিক, মানবমুক্তির সমস্যাই তাঁর দর্শনের আলোচ্য বিষয়। সংগ্রাম, হিংসা তথা সামাজিক সমস্যা দূরীভূতে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ দার্শনিক প্রজ্ঞা এই ঐক্য চিন্তার বিশ্লেষণে নিয়োজিত ছিল। অর্থাৎ বিশ্বের মূল রহস্য উদঘাটিত হয় যে ঐক্যে ও

সামঞ্জস্য চেতনায় তা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বৈজ্ঞানিক বিধি অন্বেষণের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবের কৃতি নির্ভর হিসেবে প্রতিফলিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ যে একজন দার্শনিক এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়। তিনি মূলত একজন দার্শনিক, তাঁর স্বকীয় দর্শনে সত্যান্বেষণ ছিল। তাঁর চিন্তার প্রবল মৌলিকতা তাঁর দর্শনকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। প্রাচ্য ভাবধারায় বৈষ্ণববাদ, বৌদ্ধধর্ম ও উপনিষদ তাঁকে অনেক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর দর্শনের মূল ভূমিকায় দুটি পূর্বস্বীকৃত বিশ্বাসকে প্রতিস্থাপন করে, যথা মৃত্যু বা নাস্তিত্ব ও মানবকেন্দ্রিকতা। তার লেখনির সকল শাখায় এই দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ করেছেন। এক পরম শূন্যতার অনুভব যা ভয়াবহ মনে হতে পারে অথচ যা অনিবার্য তাকে অস্তিত্বের ধারায় সার্থকতা দেওয়া বা মৃত্যুতে অমৃতের রূপে সাজান যেমন কবিকে অত্যাধুনিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মূল বক্তব্যের কাছাকাছি নিয়ে এল, তেমনই আবার উপনিষদকে অমৃত চেতনা তাঁকে মৃত্যুর বিভ্রম, নাস্তিত্বের বা শূন্যতার সংহারী রূপ অতিক্রম করতে সাহায্য করল।[১] বৈপরীত্য সংযোগে এই নাস্তিত্ব বা বিধ্বংস গভীর সত্তার অনুভবে নিয়ে গেল তাঁর দর্শন। তাছাড়া, 'মানবিকতা বোধ' এই থাকা ক্রিয়ায় কর্তার সার্থকতা প্রদান করলো, ফলে মূল স্বীকৃতি হল,"আমি আছি" । যেভাবেই হোক না কেন এই 'আমি আছি'র বিস্ময় বা রহস্যই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার সুস্পষ্ট পটভূমি রচিত করে। তিনি এই মানবকেন্দ্রিকতাকে তাঁর সমগ্র দর্শনের মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এটা তাঁর দর্শনের প্রাথমিক ভিত্তি।

গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের মত রবীন্দ্রনাথও মানুষকে প্রাধান্য- দিয়েছেন। তাঁর কাছে মানুষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়-অহং এর বিশিষ্ট নামরূপধারী প্রতিভূ নয়-সে স্বয়ম্ভুও নয়। মানবেতর বিশ্বের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও ঐক্য স্থাপন করার করার মাঝেই মানবের স্বকীয়তা নিহিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "The first stage of my realization was through my feelings of intimacy with nature." [২] তাঁর কাছে সত্য ও চৈতন্য এক অর্থাৎ যা সত্য তা এক অপূর্ব সামঞ্জস্যময় চৈতন্য স্পন্দিত। এই বিশ্ব চৈতন্যের লীলাভূমিই অস্তিত্ব। চৈতন্য নিরপেক্ষ প্রকাশ নেই, আবার প্রকাশ নিরপেক্ষ সত্তা নেই।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট করতে গিয়ে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, "শুধু প্রথম স্তর নয়, সকল স্তরেই দেখিতে পাই, একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি, আর একদিকে বিশ্বমানবজীবন- এই উভয়ের সঙ্গে পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গতায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।" [৩] সনাতন উপনিষদের পরিগ্রহ রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাকে এক নতুন রূপ ও মহত্ত্ব দান করেছে। আসলে, রবীন্দ্রমানসে যে

মানবকেন্দ্রিকতার বাস তা এক রহস্যঘন ঔদার্যে উদ্বুদ্ধ, এখানে সংকীর্ণতার স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে বলেছেন, "যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।" [৪] এই বিশ্বের অনিবার্য আত্মীয়তা 'আংশিক কিছু' হবার উপায় নেই 'কিছু হতে হলেই' , 'সব কিছু হতে হবে" এই মহান বাণী রবীন্দ্রনাথের মানবকেন্দ্রিকতায় যে ঔদার্য প্রদান করেছিল তাতে সকল গোঁড়ামি ধ্বংস হয়ে যায়। আর অন্যদিকে রবীন্দ্রদর্শনের অপর যে প্রাথমিক স্বীকৃতি বা মৃত্যু চেতনা তা সকল জীবনদর্শনেই অনিবার্য।

এসব আলোচনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র দর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁর বিশ্বাস ও মননশীলতাকে বর্জন করা যায় না, তাঁর চিন্তাধারা দর্শনকে ধারণ করে। তিনি প্রকৃত অর্থে এসব বিচারে বিশ্বজনীন দার্শনিক।

৩.২ রাজনৈতিক দর্শন

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন অত্যন্ত জটিল হলেও, তাঁর সকল মতাদর্শই বিবর্তনের পথ ধরে পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদের ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করলেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দদের সমর্থন করেছেন। তাঁর লিখিত 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার স্পষ্ট পরিচয় মেলে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন মূলত মনুষ্যত্ব বিকাশের একটা শ্রেয়োবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের সাথে জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনা ও পরমার্থ ভাবনার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে কোন দলগত স্বার্থচিন্তা ছিলনা আর এজন্যই তিনি দেশের মানুষের প্রকৃত কল্যাণের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' এ বিষয়টির সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধে তাঁর প্রবল দৃষ্টি ছিল। তিনি কখনো দেশের ঐতিহ্যবিহীন ও সেবাবিমুখ রাজনৈতিক আন্দোলন সমর্থন করেননি, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও মহৎ আদর্শকে সামনে রেখে রাষ্ট্রসাধনা করেছেন। তিনি দেশের মানুষের সুপ্তচিত্তের জাগরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক মঙ্গলের চিন্তা করেছেন। মানুষের আত্মশক্তি জাগ্রত করার জন্য গভীর সাধনা করেছেন। দেশের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি জীবনের সাথে সম্পর্কহীন কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ করাই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও স্বদেশচেতনার পরিকাঠামো হিসেবে গঠিত ছিল।

তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও স্বদেশপ্রেমের মূলে যে দেশপ্রেম তা অত্যন্ত প্রখর ও উজ্জ্বল ছিল। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে বিন্দু পরিমাণ সুবিধা দেননি, কেননা তারা দেশবাসীকে প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করেছে। তিনি মনে করেন, দেশের উন্নতি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর অন্তরে অমিত শক্তিকে সঞ্চার ও প্রয়োগ করতে হবে। দেশের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অসহায়, দুঃস্থ, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও অবহেলিত মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বের সুসম্পর্ক বজায় রেখে দেশোদ্ধারের জন্য লেখনীয় মাধ্যমে তা ধারণ করতে হবে।

তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে কৃত্রিমতার স্থান নেই তাই অপ্রমত্ত সত্যনিষ্ঠাই ছিল এর ভিত্তি। তাঁর মতে- রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্থান পাওয়ার জন্য তাদের মনে স্বাধীনতা, বীরত্ব, উদারতা, দেশপ্রেম, সত্যনিষ্ঠ, পরমত সহিষ্ণুতা এসব গুণ জাগিয়ে তোলা উচিত। কেননা, জীবনের আদর্শ মহৎ না হলে কোন জাতি উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে পারেনা। কেবল ব্যাপক উদারতা মনে ধারণ করার মাধ্যমেই মানুষের মুখশ্রীতে দীপ্তি ফুটে উঠে, নানা সংকুলতার মধ্য দিয়ে মানুষ জেগে উঠতে পারে। সংকীর্ণ মনমানসিকতা মানুষকে রোগে, শোকে, ভয়ে, দাসত্বে জীর্ণ করে তোলে যা কাপুরুষতা প্রকাশ করে। এজন্য তিনি বলেন, "সত্যকে আশ্রয় করে মহত্বে উন্নীত হইয়া সরলভাবে দাঁড়াইয়া ঝড় সহ্য করিব সেও ভালো, তবু মিথ্যায় সঙ্কুচিত হইয়া সুবিধার গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ সুখ অনুভব করিবার অভিলাষে আত্মার কবর রচনা করিব না।" [৫] এ থেকে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহে নিষ্ঠাবান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শনের গভীরে জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা নিহিত ছিল। তাঁর সময়কালে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে একটা দ্বন্দ ছিল। এ দ্বন্দ্বকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করে বিচক্ষণতার সাথে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে আদর্শের আলোকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি মধ্যপথ বা সাম্যপথ গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রকৃত অর্থে প্রকজন সমন্বয়বাদী দার্শনিক ছিলেন। নতুন ও পুরাতনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী দিয়ে তিনি সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি অতীত জীবনকে সমৃদ্ধশালী মনে করেছেন এবং অতীতের আদর্শ ধারণ করে বর্তমানের সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন কেবল পুরাণ ও কাব্যে ব্যাখ্যাত মহাপুরুষের জীবনাদর্শ রয়েছে। এসব মহাপুরুষের জীবনাদর্শ, পুরাণ ও কাব্যে ব্যাখাত জীবন আদর্শ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশে যেমন প্রয়োজন তেমনই জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের মূলে ছিল মনুষ্যত্বের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন করা। আর এজন্যই তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে সর্বজনীন মানবতার আদর্শ প্রধান স্থান দখল করে আছে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন গভীর দেশপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সবসময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের ভ্রান্তশাসন নীতি, অবিচার ও শোষণের প্রতিবাদ করেছেন মানবিক দৃষ্টিকোণের আলোকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেবাদের সমস্যা দুর করার জন্য তিনি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বনির্ভরতা ও বৌদ্ধিক উন্নতির উপর জোর দিয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষের জনগনকে অন্ধ বিপ্লবের পথ পরিহার করে দৃঢ় ও প্রগতিশীল শিক্ষার পথকে গ্রহণ করার কথা বলেন।

৩.৩ ধর্মদর্শন

রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন ও ধর্মভাবনার লক্ষ্য হচ্ছে উপনিষদের আদর্শে এক অখণ্ড ও আনন্দময় সত্তার মধ্য মানবজীবনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি তাঁর ধর্মচেতনায় দেশ ও কালের উর্ধ্বে নিজের অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি, মনন ও দর্শনকে অনুসরণ করে সত্য ও আদর্শের পথে পরিচালিত হয়েছেন। তাঁর স্বকীয় যুক্তি, চিন্তন ও মনশীলতার আলোকে গঠিত নিজস্ব ধর্মদর্শন প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও নাটকে। তিনি সংযম ও ভোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ধর্মদর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি উপনিষদের আদর্শ 'ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করো' এটা আকঁড়ে ধরে এই আদর্শকে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন।

তিনি মূলত দিব্য চেতনায় এই পদার্থিক জগতের সবকিছুকে সসীমকে অসীমের পথে পরিচালিত করেন। আর এজন্যই তিনি বলেছেন, "ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া ওঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে নষ্ট হই।" [৬] তিনি সন্ন্যাসীর আদর্শকে প্রকৃত রাজার আদর্শ বলে উল্লেখ করে বৈরাগ্য সাধনা যে ঐশ্বর্যকে মহীয়ান করে সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাছাড়া মানবজীবনের মায়া, প্রেম, দয়া, অনুরাগ ইত্যাদি অনুভূতিকেই ঈশ্বর প্রেম বলে অভিহিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মদর্শনে প্রেম সাধনার গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রেমের মাধ্যমেই ত্যাগ পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন: "প্রেমের সাধনাই সাধকদের যথার্থ সাধনা। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার মূলকথা এই প্রেমতত্ত্ব . . . তাঁহার কর্মযোগও এই প্রেমের প্রকাশ।" [৭] আর ঈশ্বরই এই প্রেমের কাঙাল। ঈশ্বর প্রেমের খেলায় নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করেছেন, এটাই প্রেম।

তবে তাঁর ধর্মদর্শনের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করে কখনোই পরমার্থকে খুঁজেননি। তিনি তাঁর কাব্য-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও পত্রে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে, সংসার ধর্মকে অবহেলা করে ঈশ্বর ও পরমার্থকে পাওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মদর্শনে প্রকৃতির অমোঘ বিধানকে স্বীকার করার কথা বলেন, প্রকৃতিকে অস্বীকার করে ঈশ্বর তত্ত্বকে পাওয়া যায় না বলে মনে করেন। কেননা, বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্তর্প্রকৃতির মিলনেই মানবজীবনের সার্থকতা আসে। যেসব দর্শন বিশ্বসংসারের এই মায়া, দয়া, প্রেম, প্রীতিকে শুধু মাত্র অলীক মায়া বলেছেন তাদের দর্শনকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

৩.৪ শিক্ষাদর্শন

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর নিজস্ব শিক্ষাদর্শন এবং তিনি বাস্তবজীবনে এই দর্শনকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সমালোচনা পোষণ করে মতবাদ ব্যক্ত করে তাঁর চিন্তা ও মননের বিকাশ ঘটান আশ্রমপীঠ ও শান্তিনিকেতনে। তাঁর শিক্ষাদর্শন ও জীবনদর্শন গভীর সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর শিক্ষাদর্শনের সাথে শিক্ষার বাহন, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার ভিত্তি, শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষার মুক্তি, শিক্ষার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় জড়িত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হলো তাই যা তথ্য পরিবেশন করে, বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবন ও গড়ে তোলে। তিনি সাবলীল শিক্ষার বাহনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর জীবনদর্শনের প্রতিটি পর্যায়ে বাংলা ভাষাকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর জীবনের অন্যতম সাধনা ছিল শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলাকে মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। তাছাড়া, বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও এই সাহিত্যের মাধ্যমে দেশের সকল স্তরে শিক্ষার বিকিরণ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন এবং এই লক্ষ্যে তিনি শিক্ষা বিষয়ক 'শিক্ষার হেরফের' এবং 'প্রসঙ্গ কথা' গ্রন্থ লিখেছেন। "প্রসঙ্গ কথা' গ্রন্থে তিনি শিক্ষার প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য একে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি দেশমাতৃকার স্বধর্মের উপর ভিত্তি করে রচিত নয় বলে এই শিক্ষা সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়তাবোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে তিনি মনে করেন। এ লক্ষ্যে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি স্বদেশী শিক্ষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে বাইরের শিক্ষাকে অভিজ্ঞতার সাথে যাচাই করে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। তাছাড়া দেশের জীবনযাত্রার সাথে সাথে শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন করে যখন দেশীয় শিক্ষার সাথে বাইরের শিক্ষাকে

আমরা মিলিয়ে দেখতে শিখবো কেবল তখনই এর যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করবো। এ বিষয়ে তিনি বলেন- "সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্যশিক্ষা, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কালের দ্বারাও ঘটিতে পারে।" [৮] তিনি জাতীয়তাকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার গতিময় দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে নতুন নতুন বিদ্যা গ্রহণে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট জীবনদর্শন ফুটে উঠে।

৩.৫ সমাজ দর্শন

রবীন্দ্রনাথের দর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর মানবপ্রেমিক অন্তরাত্মা সবসময় মানুষের কল্যাণ কামনায় ব্যতিব্যস্ত ছিল। তাঁর লেখনী কাব্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধে সমাজের মানুষের প্রতি অপরিমেয় কল্যাণ কামনার কথা ও কল্যাণবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সমাজভাবনার ক্ষেত্রে সমাজের মানুষের সাথে আন্তরিকতা, আর্তপীড়িতের প্রতি সুগভীর বেদনা এবং পল্লীর পরিবেশের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্কই ভূমিকা রেখেছে এবং সমাজের মানুষের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তুলেছে। সমাজজীবনের নানারকম সমস্যা তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে এসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং সমাধানের পথ খুঁজেছেন। সমাজভাবনায় তাঁর গভীর দৃষ্টি ও চেতনা, তাঁর সমাজচিন্তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্টের বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন সমাজ দার্শনিক।

তৎকালীন সমাজের নানা সমস্যার ভারে বিবর্তিত রূপ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চেতনায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। ঊনিশ শতকে তৎকালীন বাংলা বা ভারতবর্ষে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও রাজনৈতিক ইতিহাসের চমকপ্রদ অধ্যায় ছিল, সেখানে সমাজজীবন নানা সংকীর্ণতায় জর্জরিত ছিল। সমাজজীবনে যে সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ও জড়তা ছিল তা দূরীকরণে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের আদর্শ নিয়ে যে সকল মনীষীর আবির্ভাব ঘটে তার মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্রসেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। সমাজভাবনায় এসব মনীষীদের চিন্তা-চেতনা ও যৌর্থ কর্ম প্রয়াসে সমাজের মানুষ ফিরে পায় তাদের আত্মশক্তি ও মনুষ্যত্ববোধ। রামমোহনের পরে সমাজে যখন পুরনোর বিদায়ের ও নতুনকে বরণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার হচ্ছিল এমন সময়ে এক মহান ব্রত ও আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব

ঘটে। তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সচেতনতার সাথে সমাজের পরিবর্তনশীলতার দিকে গুরুত্ব দেন। তাঁর চিন্তা জগতের আদর্শ ও চেতনাকে গঠনমূলক কার্যাবলির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টাই তাঁর সমাজভাবনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সাধারণ মানুষের মন জয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর অন্তরাত্মা দিয়ে সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করেছেন। তিনি সাধারণ মানুষকেই সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে ভাবতেন। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম আন্তরিকতা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তিনি তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেশমাতৃকার জনগণের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, মানসিক ও সামাজিক অধোগতি লক্ষ্য করে এসবের বিরুদ্ধে মানবতার আলোকে মুক্তির আন্দোলন গড়েছেন। এই আন্দোলন সফল হওয়ার জন্য চিত্তের মুক্তি সাধনের উপরই গুরুত্ব দেন। তিনি মানুষের হৃদয় জাগ্রত করার মাঝেই আন্দোলনের সফলতা খুঁজেন। তিনি সকল প্রকার বিভেদ ও মতানৈক্যেকে পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রেমপ্রীতির আদর্শের মাধ্যমে জয় করার ঘোষণা দেন। এটাই তাঁর সমাজপ্রীতির মূল বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর মানুষ নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর সমাজদর্শন বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, তিনি সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এগুলোর উৎস অনুসন্ধান করে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি সমাজের সাধারণ সমস্যাকে জাতীয় জীবনের বাস্তব প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর সমাজ ভাবনার অনন্যতাই তাঁকে সমাজ দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩.৬ মরমিবাদ

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিরহস্যের অপরূপ লীলা ভেদ করার চেষ্টা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে বলেন, " বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহ চন্দ্র তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ এই সর্ব মানুষের জীবনদেবতার কথা বলার চেষ্টা করেছি 'Religion of Man' বক্তৃতাগুলিতে।" [৯]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শনে বিভিন্ন সাহিত্যগুরু ও মরমি কবি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর মরমিবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি মৈথিল কবি জয়দেব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র মানসে

মহাকবি কালিদাসের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও'কুমারসম্ভব' এ যে দেহাতীত প্রেম তাঁর প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক রচনায় দেহাশ্রিত প্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কালিদাসের এসব লেখনীর প্রভাবে দেহাশ্রিত প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য 'কড়ি ও কোমল', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'রাজা ও রাণী' তে তুলে ধরেন। এসব কাব্যে ভোগ থেকে ভোগ বিমুখতার আকাঙ্খার প্রতিফলন, দেহাশ্রিত প্রেম ভোগমুক্তির মধ্যে সার্থকতা ও প্রেমের সাথে পৌরুষ ও কর্মের মিলনে ভোগ থেকে কর্মের মধ্যে মুক্তি প্রতিফলিত হয়েছে।

বৈষ্ণবপদাবলীও কবির জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। বৈষ্ণব দর্শনের 'চৈতন্য চরিতামৃত', 'চৈতন্য ভাগবত', 'ভক্তমাল' এসবের প্রভাবে তিনি 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেছিলেন। তাঁর মরমি দর্শন ও ধর্মীয় ভাবাদর্শে বাউল দর্শনেরও প্রভাব ছিল। তাঁর রহস্যবাদী লেখনী 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালী'তে লালন শাহ এর বাউল দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তাঁর দর্শনে অবাঙালি মরমি কবি কবীর, দাদু, মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধকেরও প্রভাব রয়েছে। অবাঙালি কবি জ্ঞানদাস বাঘেলি'র রচনার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ কাব্যগানও লিখেছেন, অন্যান্য রচনায় ও এটা দেখা যায়।

৩.৭ নারী স্বাধীনতার সমর্থন

রবীন্দ্রনাথের দর্শনের অন্যতম একটা দিক হলো নারী স্বাধীনতার সমর্থন করে নারীকে আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীনপ্রিয় ও কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি ইউরোপীয় নারীদের এসব স্বভাবসুলভ গুণ দেখে তা ভারতবর্ষে প্রচলন করার কথা বলেন। তিনি নারী পুরুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা সমভাবে প্রয়োগ করে একত্রে কাজ করার কথা বলেন। এ সম্পর্কে তিনি 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' এ বর্ণনা দিয়েছেন।

ইংল্যান্ডে নারীদের নিজেদের ভাগ্য জয় করার অধিকার ও অবাধ স্বাধীনতা দেখে দেশের নারীর জন্য কবি মন ব্যথিত হয়, যেখানে নারীরা বঞ্চিত ছিল। তিনি উপলব্ধি করেন, "মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যাবে।"[১০] তিনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং নারী জীবনের মুক্তি কামনা করেছেন। তিনি নারী স্বাধীনতা বিশ্বাস করলেও এই স্বাধীনতা বলতে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয় বরং মানবচিত্তের বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটানোকে বুঝিয়েছেন। তিনি মনুষ্যত্বের সাধনায় নারী পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। সর্বোপরি নারী জীবনের মুক্তি কামনা করেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন জীবনবাদী দার্শনিক।

৩.৮ ঈশ্বরচেতনা ও মানবতা

রবীন্দ্রনাথের পুরো জীবনদর্শনের সাথে ঈশ্বরচেতনা ও মানবতাবোধের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তিনি ঈশ্বর বলতে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাকে বুঝাননি। তিনি ঈশ্বর বলতে কর্মী ঈশ্বরকে বুঝিয়েছেন। যিনি মানব সংসারে অবস্থান করেন, মানুষের মধ্যেই যার মূর্ত প্রকাশ ঘটে। তাঁর ধর্মও ছিল মানব ধর্ম। মানুষে-মানুষে যে ধর্ম একতা ও সহানুভূতির বন্ধন গড়ে তুলে সেই মানবতার ধর্ম তিনি প্রচার করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা ও দর্শন এক অখণ্ড মানবতাবাদের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। সর্বজনীন মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন, মানুষের মাঝে বাঁচতে চেয়েছেন। তিনি সারাজীবন মানুষের জয়গান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি একজন মানবতাবাদী দার্শনিক ছিলেন। তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি মানুষের অন্তর্গত জগৎকে যেমন নাড়া দিয়েছেন, তেমনি তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য অঙ্গনে ঠাঁই পেয়েছে। তিনি তাঁর সমস্ত জীবন জুড়ে মানবতার কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অনেক রচনাকে আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ করেছে। তিনি তাঁর লেখনীতে মানুষের চিত্তের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানবতার মুক্তির দীক্ষা দিয়েছেন। কেবল দার্শনিক দৃষ্টির ফলেই তাঁর এমন উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে। তাই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ শাখার নয় তিনি বিশ্ব মানুষের।

তথ্য নির্দেশিকা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৩), *শান্তিনিকেতন*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, 'মৃত্যুর প্রকাশ' ।

২। Rabindranath Tagore (1949), *The Religion of Man*, London: George Allen and Unwin, P. 18

৩। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯৬১), *উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস*, কলিকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রা. লি., পৃ. ৬৩

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৩), *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, সমালোচনা, একটি পুরাতন কথা, পৃ. ১৫৭

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬৮), *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ব্রহ্মমন্ত্র, পৃ. ৬১৯

৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬১), *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, , পৃ. ১৯৪

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৩), *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বিশ্বভারতী: ১, পৃ. ৩৪৫

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৭), *মানুষের ধর্ম*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ৮১

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬১), *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র*, ৬ষ্ঠ পত্র, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ৮৪

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতাবাদ

রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতাবাদ

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম এবং সারাবিশ্বে তিনি অনন্য প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত। রবীন্দ্র-সাহিত্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সুখ, দুঃখ, মানবতা এসব মিলিয়ে সমগ্র সমাজের এক দর্পণ হিসেবে ফুটে উঠে। রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতাবাদের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও মননের ফলশ্রুতি। তাঁর সাহিত্যে সকল আলোচনার মূল কেন্দ্র ছিল মানুষ। তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মের মূলে ছিল এই জগত-সংসারের কল্যাণ সাধন করা এবং তাঁর কর্মের প্রধান-অপ্রধান ভূমিকায় দেখা গিয়েছে মানবতাবাদের উপস্থিতি অর্থাৎ বিশ্ববোধ ও মানবতাবাদ নিয়ে তাঁর সকল কর্ম কাব্য-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও পত্র এসব রচিত হয়েছে। তাঁর কোনো সাহিত্য থেকে মানবতাবাদকে পৃথক করা যায় না। মানবিক মর্যাদাবোধই তাঁর প্রতিটি রচনাকর্মের মূল বিষয় বলেই তাঁর বাল্যকালের রচনায়ও মানবতাবাদের উৎস খুঁজে পাই। তাঁর রচনাকর্ম 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে ' মানবতার সুর বেজে উঠে। পরবর্তীতে তার লেখা 'The Religion of Man' গ্রন্থটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "The idea of the humanity of our God or the divinity of Man the Eternal, is the main subject of this book." [১] অর্থাৎ এ গ্রন্থে ঈশ্বরের মানবত্ব বা মানবের দেবত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি, মানুষ ও স্রষ্টাকে এক করে দেখেছেন। মানবতা ও ভালবাসার মিশ্রণে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানুষকে তিনি অবলোকন করেছেন এবং মানবতার চরম মুহূর্তেও মানুষের উপর আস্থা রেখেছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল কথা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির মূল্য দিয়ে মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে মানুষকে অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখা। তিনি নিজস্ব চিন্তা- চেতনার প্রতি দৃঢ় থেকে তাঁর অনন্য প্রতিভা দিয়ে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে দেখেছেন। তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপট তাঁর মনে বিস্ময়, বিমুগ্ধতা ও শক্তি সঞ্চারিত করেছিল।। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন "যারা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা এ কথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহন করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল'না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি।" [২] তিনি পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বলেই মানুষের প্রতি আস্থা রেখে মানুষের ধর্মে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অমানবিক সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাতীত বোধ ও মনীষা মূলত নানাভাবে মানবিকতাকেই স্পর্শ করে। তিনি মানবিকতা ও মরমি সাধনায় প্রকৃতির সাথে মানুষের আবার মানুষের সাথে প্রকৃতির বহু বৈচিত্র্যময় সম্পর্ক তাঁর সৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। মানবতাবাদী রামমোহনের মতো

রবীন্দ্রনাথও পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে সকল প্রকার জড়তা, গোঁড়ামি ও অবনতি থেকে মুক্ত করে আধুনিকতায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের মঙ্গল কামনায় সচেতন ও আগ্রহী ছিলেন বলেই নর-নারীর সমতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, মানুষের ঐক্য দিয়ে সহযোগিতামূলক সমাজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেই সাথে পরিকল্পিত শিক্ষার চর্চা করেছেন। তাঁর কাছে মানবিক সম্পর্কই হচ্ছে প্রধান বিষয় এবং তিনি মানব সম্পর্কের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।

যেহেতু রবীন্দ্রদর্শনের কেন্দ্রস্থলে মানুষের অবস্থান তাই তিনি সকল উপলব্ধি, সৌন্দর্যানুভূতি, মর্ত্যপ্রেম, ধর্মবিশ্বাস, মানবমুখী জীবনের বিভিন্ন ধারা উপলব্ধি করে সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন করে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবেছেন। তাঁর কবিতায় দেখতে যায় মানব জীবনের বহুমাত্রিক রূপ ও স্বরূপের অন্বেষণই ছিল মূলত বিষয়বস্তু। তাঁর কাব্যেও প্রকৃতির প্রাণময় সত্তার অনুভবের বিষয় ফুটে ওঠে এবং তাঁর 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া' এসব কাব্যে তিনি আত্মমুখী ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবতাবাদ অতিক্রম করে বিশ্বমানবিকতায় পৌছেছেন। মানবপ্রেমই তাঁর কাব্য সাধনার মূল উপজীব্য এজন্য মানুষকে তিনি দেখেছেন বহুবিধ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর বিশ্বাস সাহিত্যের বিষয়ই মূলত মানব চরিত্র ও মানব হৃদয়। মানবজীবনের বিচিত্র লীলা রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাকে সকল দিক দিয়ে গ্রহণ করার জন্য একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা "কড়ি ও কোমল" এর কবিতা গুলোর মর্মকথা এবং এই মর্মকথাটি ব্যক্ত হয়েছে গ্রন্থের প্রথম কবিতাগুলিতে।[৩] মানবিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে কবি লিখেছেন,

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।"

('কড়ি ও কোমল' "প্রাণ")

তিনি ছিলেন আশাবাদী, তাঁর সাহিত্যের প্রতিটি রচনায় মানুষের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। সত্যিকার অর্থে তিনি সত্য, সুন্দর ও মানবতার সাধক ছিলেন। তাঁর নিজের অন্তরাত্মায় নিজের স্বরূপ দেখেছেন এভাবে মানুষকে উপলব্দি করে মানুষের মাঝে অসীম প্রেম ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মানুষের অসীম সম্ভাবনাকে সৃষ্টিশীলতায় তুলে ধরেছেন। তিনি পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষকে অনেক বেশি ভালবাসতেন বলেই প্রত্যেক মানুষের স্বকীয় মর্যাদাকে স্বীকার করেছেন এবং মানুষের স্বকীয় মর্যাদা বিকশিত হলেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নৈতিক সংহতি ও নৈতিক শক্তির সমন্বয়ে তিনি মানুষের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। প্রকৃত অর্থে তিনি সৌন্দর্যবোধ ও মানবতার

উপলব্ধিকেই সারাজীবন লালন করেছেন। পরমসত্তার শ্রেষ্ঠ রূপই হলো তাঁর কাছে বিশ্বমানবের রূপ। সমাজের অসহায়, নির্যাতিত, অবহেলিত মানুষের প্রতি দরদ ও সহযোগিতাই তাঁর মানবতাবাদের মূলকথা। তিনি মানবাত্মার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন মানবকল্যাণে এবং মানুষের চরম দুর্ভোগের অভিযাত্রাকে অতিক্রম করে চিরকালের মানুষ হিসেবে উন্নতির কথা ভেবেছেন।

৪.১ রবীন্দ্র কাব্য-কবিতায় মানবতাবাদ

সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ থাকলেও কাব্যসাধনাই যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজীবনের সাধনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও কাব্য যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনায় পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগ্য-উত্তরসূরী ছিলেন এ প্রসঙ্গে সুনীল চন্দ্র সরকার বলেন- "১৮৬১ সাল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে শুরু হয়েছে বদলের পালা। উচ্চারিত হয়েছে একটি যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাণী, শুরু হয়েছে এক উন্নততর সমাজজীবন গঠনের প্রয়াস। যে ধরনের চিন্তাবিপ্লবে অন্যদেশে দীর্ঘস্থায়ী মত-বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হত, তাই মহর্ষির ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করল বিদ্বজ্জন সমাগমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। বাধা বিরোধ তর্ক যা উঠল তা শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের পরিবেশটিকে অযথা বিক্ষুব্ধ না করেই নিরস্ত হ'ল বা অপেক্ষা করতে লাগল ভবিষ্যৎ সুযোগের। জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে প্রতিমা পূজা অন্তর্হিত হ'ল ধ্বনিত হ'তে আরম্ভ হ'ল বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদ-উপনিষদের মন্ত্র। ভারতের দূরতম অতীতের মর্মবাণীর একটা ঢেউ এসে যেন ঐ মহর্ষির বাসস্থানটিকে ভাসিয়ে তুলল কাল সমুদ্রের প্রবাহমানতায়।" [৪]

বিভিন্ন গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র কাব্যে তাঁর মানসচিন্তা ও জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কাব্য-কবিতার মধ্যে মূলত যেসবে মানবতাবাদ ও সাম্যচিন্তা ফুটে ওঠেছে সেগুলোই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি মনে করেন, মানুষ যখন তাঁর নিজের গভীর অনুভূতি ও মানসচিন্তা দ্বারা তাঁর ক্ষুদ্রজীবনকে বিশ্বজীবনের মাঝে বিলিয়ে দেয় তখন এই বিশ্বজগতের সবকিছু তাঁর আপন হয়ে যায় এবং বিশ্বপ্রকৃতির মায়ায় সে বাধা পড়ে তখন আর ক্ষুদ্র বলে কিছু থাকেনা। ফলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সীমা ও অসীম এবং পূর্ণ ও অপূর্ণের মধ্যে এক মহান ঐক্য সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্র মানসে প্রতি ক্ষণে এই চেতনার প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি জীবনের গভীর উপলব্ধির অজানা রহস্যময় পথ ধরেই কাব্য প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং ধর্মোপলব্ধি করেছিলেন। জীবনের বহুবিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, বিকশিত করেছিলেন তাঁর বিশ্বমানবিকতাবোধ। কিশোর বয়সেই কবি'র বিশ্বমুখিতার পরিচয় ফুটে ওঠে এভাবে,

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!

('প্রভাত সংগীত' "প্রভাত-উৎসব")

এই থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, কবিচিত্তে বিশ্বপ্রাণের দোলা লেগেছে। 'ক্ষুদ্র আমি' থেকে 'সর্বজনীন আমি' তে কবি বিশ্বের অনন্ত স্রোতে ভেসে সমগ্র স্পর্শের মাধ্যমে আনন্দ পেতে চান।[৫] বিশ্বজীবন থেকে অসীম ও চিরন্তন মানবতার রাজ্যে প্রবেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন শান্তি নিকেতন বক্তৃতামালায়। সেখানে তিনি বলেছেন, "জীবন যখন ঝর্ণার মতো ঝরছিলো তখন সে ঝর্ণা রূপেই সুন্দর, যখন সে নদী হয়ে বেরুল তখন নদী রূপেই সার্থক, যখন তার সঙ্গে চারিদিক থেকে উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখা-প্রশাখায় ব্যক্ত করে দিলো তখন মহানদ রূপেই তার মহত্ত্ব-তারপরে সমুদ্রে এসে যখন সে সঙ্গত হল তখন সেই সাগর সঙ্গমেও তার মহিমা। . . . . . বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্র ছিল তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানস ক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলন ক্ষেত্রে গেল তখনও সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত ক্ষেত্রে গেল তখনও সে সুন্দর।" [৬] কবির হৃদয় জগৎ প্রেমে আবদ্ধ ছিল এবং মানব প্রীতির গান তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠেছে।

বিশ্ব মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি নিজের ক্ষুদ্র মানবসত্তা দিয়ে জীবনের যে সার্থকতা খুঁজেছেন তা ফুটে ওঠেছে 'প্রভাত সংগীত' কাব্যে। তাঁর প্রথম দিকের রচনা ও চিন্তাধারায় যে মানবতাবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। পরে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা অবশ্য বিশ্বানুভূতিতে রূপ লাভ করে। যদিও কবি বলেছেন, "প্রভাত সংগীতে যে অবস্থায় আমার প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিণত ভাবনা নিয়ে অপরিস্ফুট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার কথা আজও আমার মনে আছে।" [৭] অথবা যখন তিনি আবার বলেন, "তাই বলে রাখছি, প্রভাত সংগীতে এ-সমস্ত লেখার আর কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো-আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।" [৮] তবে এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে তিনি নিজেই সমর্থন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে লিখেছেন, তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখাই সংগত।" [৯] প্রথম দিকে তাঁর বিভিন্ন কাব্য ও জীবন উপলব্ধিতে যে মানবতাবাদের জয়গান করা হয়েছে তা নিতান্তই আত্মমুখী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিলো। তাঁর কবি সত্তা সেখানে 'পাষাণ কারা ভেঙে', 'জগৎ প্লাবিয়া' গান গেয়ে বেড়াবার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছে।[১০] আত্মমুখী ছিল বলেই পরবর্তীতে তাঁর কবিসত্তা বিশ্বজনীন মানবতাবাদের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছিল। 'প্রভাত সংগীত' এর "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায় তিনি বলেন:

". . . আজি এ প্রভাতে কী জানি কেন রে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।
জাগিয়া দেখিনু চারিদিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
* * *
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছাড়াইয়া
দিবরে পরাণ ঢালি।"

('প্রভাত সংগীত' "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ")

কবি নিজেকে জানতে চেয়েছেন, বিশ্বব্যাপী যে চিরন্তন মানবধারা রয়েছে তার সাথে নিজের ক্ষুদ্র মানবসত্তাটিকে মিলিয়ে নিজেকে বিকশিত করার মাধ্যমে জীবনের সার্থকতা খুঁজেছেন। ফলে কবির আত্মোপলব্ধি তাঁকে অহমিকা মুক্ত করে তাঁর আত্মপরিচিতি আবিষ্কারে সক্ষম করে। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে মূলত 'প্রভাত সংগীত'এ এবং 'প্রভাত সংগীত'এর মধ্য দিয়ে কবি প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরকে মিলিত করেছেন, জীবনের বহু বিচিত্র লীলার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ করেছেন এবং আত্মঅহমিকা দূর করে পরম প্রশান্তি নিয়ে কবি বলেছেন:

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কতগান
সহসা পাইনু পরিমল
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

('প্রভাত সংগীত' "পুনর্মিলন")

জীবন, জগৎ ও জীবনের অসীম সম্ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবি মানুষের অহংবোধ দূর করার মাধ্যমে বিশ্বাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার কথা বলেন। কবি অসীমের সাথে মানব মহিমাকে একাত্না করার নিমিত্তে তাঁর সকল অর্ঘ্য, সকল শ্রদ্বাঞ্জলি নিবেদন করেছেন এবং কাব্য ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, "সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়বে আর সেখানে থেকে প্রতিধ্বনিত রূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে ধ্বনি হয়ে।" [১১]

'প্রভাত সংগীত'এ কবির যে আত্ম্যাধিকতা প্রকাশ পায় তাই পরিণত বয়সের রচনা 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'তে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোনো বিশেষ ধর্ম ও সংস্কারে মানুষ জন্ম লাভ করে না এই বাণীতে বিশ্বাস করে তিনি জীবনকে বিস্তৃত পরিমণ্ডলে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর কাছে মানবজীবন সীমাবদ্ধ নয় বরং অসীমের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের যুগে জগৎ ও জীবনের ভাবমূর্তিকে প্রজ্ঞালোকে প্রথম আবিষ্কারের সুযোগ পান বলে এখানেই মানবজীবনের অন্তর্নিহিত সত্যের সান্নিধ্য লাভ করেন। কবি জীবনের গভীর অর্থ খুঁজতে গিয়ে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের সূচনাংশে বলেন, "কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর-একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।" [১২] বিশ্বব্যাপী যে চিরন্তন মানবধারা, দেশ ও কাল যাকে খণ্ডিত করে না, বিভেদ ও বৈষম্য নেই যেখানে তার সাথেই কবি নিজের ক্ষুদ্র মানবসত্তাকে মিলিয়ে জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। এমনভাবে এই বিশ্বে তরঙ্গ হয়ে দোলা দিতে চান, যেখানে মৃত্যুও তাঁকে মানব থেকে আলাদা করতে পারবেনা, মানুষের আশা, ভালবাসা, আনন্দ, চাওয়া, স্নেহ-প্রীতি ও প্রাপ্তির মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর এমন কামনা ব্যক্ত করে লিখেছেন:

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

('কড়ি ও কোমল' "প্রাণ")

মানবের মাঝে বেঁচে থাকার এই আর্তি মানবপ্রীতির মধ্য দিয়ে মানবতাবোধের চিত্রই ফুটিয়ে তোলে। এভাবে পূর্ণমানবের পথে কবি পদচারণা শুরু করেন। অহমিকার অশুভ শক্তি থেকে মুক্তির জন্য কবি দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন:

যাত্রাকরি বৃথাযত অহংকার হ'তে,
যাত্রাকরি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রাকরি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয়, মা গো, যাত্রাকরি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।

('কড়ি ও কোমল' "মঙ্গলগীত")

অহংবোধ পরিত্যাগ করে কবি বিশ্বমানবতার ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং এই কাব্যে শিল্পের মধ্যে অখণ্ড মানব হৃদয়ের সাথে অহংমুক্ত নিজ হৃদয়ের সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এভাবে তিনি মানবতার বিশাল স্তরে উন্নীত হন। কবি দৃঢ়চিত্তে বলেন, "অহমিকার প্রভাবেই যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়। যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থই অনুভব করব, যথার্থই প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে তাকে প্রকাশ করে তোলাই তার স্বাভাবিক পরিণাম। ভিতরকার একটা শক্তি ক্রমাগতই সেইদিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা মনে হয় না, সে একটা জগৎ ব্যাপ্ত শক্তি। নিজের কাজের মাঝখানে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত আর একটি পদার্থ এসে তারই স্বভাবমত কাজ করে। সেই শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করাই জীবনের আনন্দ।" [১৩] এর মাধ্যমে কবি যে অহমিকা ত্যাগ করে আত্মশক্তির জয়গান করেছেন তা মানুষকে মানবতার পথে চালিত করে।

কবির 'ছবি ও গান' কাব্যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সংকীর্ণ মানসিকতা কেটে গিয়েছিল। কবি এখানে বিশ্বাত্মার সাথে মিলিত হতে চেয়েছেন। তবে এ সময় কবিমনে সারাক্ষণ অস্থিরতা বিরাজ করতো কেননা বিশ্বাত্মার সাথে একাত্ম হওয়ার সঠিক পথ অনুসন্ধান করা কবির তখনো শেষ হয়নি। কবি জীবন সম্পর্কে যে গভীর অনুভূতি লাভ করতে চেয়েছেন সেজন্য কবি চিত্তের যে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা তা 'ছবি ও গান' কাব্যের "পাগল" ও "মাতাল" কবিতায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। কবি বলেন:

বুঝিরে
চাঁদের কিরণ পান করে ওর ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি
কাছে ওর যেয়োনা,
কথাটি শুধায়ো না,
ফুলের গন্ধে মাতাল হ'য়ে বসে আছি একাকী।

('ছবি ও গান' "মাতাল")

জীবনবাদী ও মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের উন্মেষকালেই প্রকৃতি, জীবন ও জগৎকে চিনেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন চিত্র এঁকেছেন। তিনি মানবজীবনকে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অবলোকন করেননি বরং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং বিশ্বাস করেন যে মানুষ সীমিত পরিসরে জন্মগ্রহণ করলেও অসীমের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আজীবন মানবতাবাদ লালন করা কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম দিকের লেখা কাব্য 'প্রভাত সংগীত', 'কড়ি ও কোমল' এবং 'ছবি ও গান'এ যেমন জীবন-দর্শন ও মানবতাবোধের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন তেমনই 'মানসী' কাব্যেও এ চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি এখানে মানুষের সাথে বিশ্বাত্মার আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তাই 'মানসী' কাব্যে কবি বলেন:

... একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু
প্রাণমন আপনার-
হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে
পরশ লভিনু তার।
ধন্য হইল মানবজনম,
ধন্য তরু প্রাণ
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়,
জাগিল হর্ষগান।
দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে গেল ভয়লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎ মাঝে
আমারও রয়েছে কাজ।।

('মানসী' "পরিত্যাক্ত")

কবির মতে বিশ্বের বিশাল মানবজাতির মধ্যে যে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য ও বৈষম্য দেখা যায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কবি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেন:

অন্তরমাঝে সবাই সমান
বাহিরে প্রভেদ ভবে

('মানসী' " নিন্দুকের প্রতি নিবেদন")

এই জগত সংসারে কেবলই স্বার্থপরতা, সংসারে সকল বিভেদ ও বৈষম্যের উৎস এবং একে ত্যাগ করে বেঁচে থাকার যে দৃঢ় প্রত্যয় ও দৃষ্টিভঙ্গি তা মানুষকে সাম্যবোধের সাথে মানবতাবাদের দিকে পরিচালিত করে। আর মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টি দিয়ে বৃহৎ জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে দুর্গত, অবহেলিত

মানুষের দিকে তাকিয়েছেন। মানবজীবন সম্পর্কে কবির গভীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁর জীবন-দর্শনের পরিচয় স্পষ্ট হয়। কবির জীবন-দর্শন সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, "রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জগৎ-তত্ত্ব, সমস্ত জীবনতত্ত্ব গড়ে উঠেছে সেই মানুষের তত্ত্বের উপর, সৃষ্টি যার স্বভাব, মুক্তি যার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব ভাবনারূপ পেয়েছে তাঁর অনুভূতিতে, তাঁর সামঞ্জস্য চেতনায়, তাঁর সৌন্দর্যবোধে। আর তাঁর বিশ্বভাবনা বস্তু পেয়েছে, পূর্ণতা পেয়েছে স্রষ্টা মানুষের তত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ মানবতত্ত্বটি তাঁর বিশ্বাসের জগতের কেন্দ্রের শক্তি।" [১৪]

'মানসী' কাব্যেই কবি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর কবি সত্তা অখণ্ড বিশ্ব মানবাত্মার সাথে মিলিত হতে চায়। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কবি নিজের অন্তরাত্মাকে একনিষ্ঠ সাধনায় নিয়োজিত রাখেন।

পরবর্তীতে 'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্র মানসের শ্রেষ্ঠতম প্রবণতা মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং এর সাথে কবির নিবিড় প্রকৃতি চেতনা, মৃত্যু চেতনা, ধর্মানুভূতি এবং মানবজীবনের উপলব্ধি সম্পর্কে উন্মেষ সাধিত হয়। যদিও কবির জীবনের প্রথমদিকের কাব্যগুলোতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনুভূতি, মানবতাবোধের চিত্র বেশি ফুটে উঠে তবুও 'সোনার তরী' কাব্যে মানবতাবোধের শিখরে পৌছে দেবার যে পথ নির্দেশিত হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। কবি যেহেতু প্রতিনিয়ত বিশ্বমানবের সাথে আকুল হয়ে মিলিত হতে চেয়েছেন, তাই বলেছেন:

'হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস-নিশীথে।
('সোনার তরী' "বিশ্বনৃত্য")

'সোনার তরী' কাব্যের মাঝে শুধু "বিশ্বনৃত্য" কবিতায় নয় জীবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের সাথে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ শাশ্বত মূল্যবোধকে "প্রতীক্ষা" এবং "নিরুদ্দেশে যাত্রা" এসব কবিতায়ও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই "সোনার তরী" কবিতায় কবি বলেন:

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ভরা-পালে চলে যায়,
কোনোদিকে নাহি চায়, ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
('সোনার তরী' "সোনার তরী")

এসবই রবীন্দ্র জীবনদর্শনের প্রতিফলন, জীবনদেবতার অনুভূতি, এর মধ্য দিয়ে মানবজীবনকে সীমাহীন ভালোবাসায় আবদ্ধ করার প্রয়াস ফুটে উঠে। বিশ্বসংসারের মধ্যে মানুষে মানুষে যে বিভেদ, বৈষম্য এসবে রবীন্দ্রনাথের মন বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে উঠে বলে তিনি মানুষকে সমবেদনার হাত প্রশস্ত করে মানুষের মাঝে যে ভগবান বিরাজ করে তা জাগ্রত করার আহ্বান জানান। এই বিশ্বের মানুষের মধ্যে যেন কোন বৈষম্য না থাকে সেজন্য বলেন:

ইচ্ছা করে মনে মনে,
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশদেশান্তরে
অথবা,
সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।
('সোনার তরী' "বসুন্ধরা")

এভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সাথে একাত্ম হওয়ার বাসনা করেছেন, সাম্যবোধের চেতনায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর চেতনায় প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিনিয়ত।

'চিত্রা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় তাঁর জীবনদর্শন ও মানবতাবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে কবি "জীবনদেবতা" কবিতায় স্রষ্টার সাথে মানুষের যে সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে স্রষ্টার যে সম্পর্ক তা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কবির ঈশ্বরানুভূতি, চিন্তা চেতনা, এসব কিছু আস্তিক্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় বহন করে যদিও তিনি কোনো বিশেষ ধর্মীয় মতাদর্শের অনুসারী নন এবং তিনি সবকিছুর মাঝে ঈশ্বরকে খুঁজেছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন, বিশ্বের যেখানে যত বিভেদ, বৈষম্য ও ক্ষুদ্রতা দেখেছেন সমস্ত কিছুই উপেক্ষা করেছেন। মানবজীবনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, "মানুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম, তখনি মানুষ বুঝিতে পারে- এই রহস্যই প্রেমের রহস্য, এই তত্ত্বই সৌন্দর্যতত্ত্ব, এই খানেই মানুষের গৌরব, আর যিনি মানুষের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ, কেননা সীমার মধ্যেই তিনি

আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন।" [১৫] তিনি সীমা এবং অসীমের মাঝে এক ও অভিন্ন সহাবস্থানের কথা বলেছেন।

আর এর মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ একক ব্যক্তিসত্তার আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে দ্বৈতের সাধনায় রূপ লাভ করেছে। এভাবে তিনি চরম উপলব্ধির মধ্য দিয়েই জীবনদেবতার কাছাকাছি পৌছালেন। জীবনদেবতার মধ্যে কবি তাঁর জীবনের সমস্ত প্রাপ্তি খুঁজে পান। কবি তাঁর সকল শ্রদ্ধাঞ্জলি জীবনদেবতার পানে নিবেদন করেছেন এবং আহবান করেছেন:

... ... শুধু জানি
সে বিশ্ব প্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দুরে জীবনের সর্ব অসম্মান;
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তকউচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধুলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক। ... ...

('চিত্রা' "এবার ফিরাও মোরে")

এখান থেকেই মূলত রবীন্দ্রনাথের আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে বিশ্ব মানবিকতার দ্বারপ্রান্তে পৌছার যে সাধনা তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তিনি 'অহং' ত্যাগ করে মুক্ত মন নিয়ে প্রকৃতির সাথে একত্মাতা পোষণ করে বিশ্বের সাথে মহামিলনের পরম অনুভূতি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। প্রকৃতি, মানুষ আর ঈশ্বর এই তিন রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধি দিয়েছে।

আবার, 'চৈতালি' কাব্যেও মানুষের মাঝেই স্রষ্টা বিরাজমান, মানুষের সেবা করাই পরম ধর্ম, মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা এই বাণী কবি কণ্ঠে বেজে উঠেছে বহুবার। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন:

দেবতামন্দির মাঝে ভক্ত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।

('চৈতালি' "দেবতার বিদায়")

তিনি যে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছেন তা 'চৈতালি' কাব্যের "আশার সীমা" কবিতাতেও ফুটে ওঠে। আবার মানবজীবনের গুরুত্ব, তাঁর জীবনদর্শন, দার্শনিক উপলব্ধি এসব বিষয় 'চৈতালি' কাব্যের "দেবতার বিদায়", "পূণ্যের হিসাব" ও "বৈরাগ্য" ইত্যাদিতে কবিতার মাঝে পাওয়া যায়। মানবজীবনকে তিনি অসীম আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করার মাঝেই তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। এজন্য তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "তাই উপনিষৎ-আনন্দরূপমমৃতং-ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত

বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায় যা ফুরিয়ে যায় তাতে আমাদের আনন্দ নেই-যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি অমৃতকে দেখি সেই খানেই আমাদের আনন্দ।" [১৬] এভাবে তিনি তাঁর জীবনদর্শনে মানবতাবাদের ঘোষণা দিয়ে মানবজীবনের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যকে আরো স্পষ্ট করে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অপরূপ সৃষ্টি 'কল্পনা' কাব্যে আত্মঅহমিকা ত্যাগ করে মুক্ত আত্মার অধিকারী হওয়ার সাধনা করেছেন এবং তাঁর নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের মানস প্রতিমাকে, নিজের সাধের সাধনাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বলেন:

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগণ বিহারী!
আমি আপন মনে মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা-
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগণ-বিহারী!

('কল্পনা' "মানস প্রতিমা ")

মানুষের হৃদয়ে যে 'মহামানব' বাস করে তাঁর দিকে তিনি ধাবিত হয়ে 'কল্পনা' কাব্যের "রাত্রি" কবিতায়ও অসীমের সাথে একাত্মা হবার চেষ্টা করেছেন এবং মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন, জীবনকে গভীরভাবে ভেবেছেন।

ঈশ্বরানুভূতির সম্পর্কে সুচিন্তিত দৃষ্টি 'কল্পনা'য় লক্ষ্য করা যায়, বিশ্বজীবন ও ঈশ্বরানুভূতি সম্পর্কে কবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যাখা করেছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বলেন "সর্বেশ্বরবাদ রবীন্দ্র দর্শনের ভিত্তি। কবির জীবনে এ এক পরম উপলব্দি যে, যে শক্তি এই বিশ্বের মধ্যে লীলা করেছেন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তিনি সকল দেশ, সকল কাল, সকল মন, সকল বস্তু পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন।" [১৭] রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তর-সম্পদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মনে করেন অন্তর-সম্পদই মানুষকে মহৎ করে যা মানবিক বিশ্বাসে স্থির রাখে আর সেজন্যই প্রেমের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবি 'ক্ষণিকা'য় মোহমুক্ত জীবনের সহজ সাধনার পথ খুঁজেছেন। 'ক্ষণিকা' পর্বে প্রথমে তাকে জীবনের প্রতি নিরসক্ত মনে হলেও আসলে তিনি ক্ষণিকের জন্য ব্যাথা, বিচার, সন্ধান, সমস্যা সবকিছুকে

দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন কিন্তু জীবনের পরিপূর্ণ অর্থ প্রদান করতে ভুলেননি। 'ক্ষণিকা'র বিভিন্ন কবিতায় চটুল ভঙ্গিমার ফাঁকে কবির অন্তরের মর্মস্থলের দিকে তাকালে বুঝা যায় কোনো এক গভীর বেদনার উৎস থেকে কবি লিখেছেন:

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি-প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোক!
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।।

('ক্ষণিকা' "উদ্বোধন")

এভাবে 'ক্ষণিকা' কাব্যের "উদাসীন", এবং "সুখ-দুঃখ" কবিতায় মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে মানবজীবনকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন এবং মানবজীবনের মাঝে ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন। এই কাব্যের "কল্যাণী", "সমাপ্তি", "পরামর্শ", "আবির্ভাব" এসব কবিতায় তাঁর শান্ত সৌন্দর্য ও দার্শনিক উপলব্ধি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। কবি প্রেম ও সৌন্দর্য দিয়ে এই বিশ্বজীবন, বিশ্বজীবনের তাৎপর্য ও ঈশ্বরানুভূতিকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

'কথা' কাব্য থেকে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত কবি-জীবনের একটা জীবনসন্ধিযুগ হিসেবে বিবেচিত। এখানেই কবি জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছে যা 'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থে সূত্রপাত এবং পূর্ণ পরিচয় মেলে 'কল্পনা' কাব্যে। 'কল্পনা'র জীবন থেকে 'নৈবেদ্য' কাব্যের জীবনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে, বিশ্বজীবনের তাৎপর্য, গভীর জীবনের আকুতি, ঈশ্বরানুভূতির সম্পর্কে সুচিন্তিত দৃষ্টি 'কল্পনা'য় লক্ষ্য করা যায়, তার পরিণতি 'নৈবেদ্য' থেকেই শুরু হয়। এর ঠিক মাঝেখানে 'ক্ষণিকা' কাব্যের আবির্ভাব।

'নৈবেদ্য' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় প্রার্থনার মাধ্যমে স্বদেশ ও স্বদেশ-মহিমা সম্পর্কে যা বলেছেন তা মানবতাবাদেরই পরিচয় বহন করে। এর সবগুলো কবিতাই একটা মহান অধ্যাত্ম-আদর্শে বাঁধা, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা যে কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে, তা হলো:

চিত্ত যথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী,
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নিবারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থ তায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালি রাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্মচিন্ত আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

('নৈবেদ্য' "৭২ সংখ্যক কবিতা")

কবি এখানে উন্নত মানব-মহিমার স্বর্গ রচনার করেছেন। সেখানে মানুষের জ্ঞানমুক্ত, শির উন্নত এবং চিত্ত ভয়শূন্য আর এরকম স্বর্গের প্রার্থনাই কবি করেছেন। বিশ্বমানবতার একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে তিনি পৃথিবীর সকল কিছুকেই পরমযত্নে গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর অধ্যাত্ম সাধনা মানুষ ও সংসার নিরপেক্ষ নয় এজন্যই 'কড়ি ও কোমল' থেকে আরম্ভ করে 'চৈতালি' পরবর্তী কাব্যে যখন মহাজীবন তাঁকে ডাক দিয়েছে তখনও মানুষের জয়গান করেছেন এবং মহাজীবনের মধ্যে আত্মবিসর্জন করার একটা প্রবল আকাঙ্খা পোষণ করেছেন। কবি যেখানে প্রথম যৌবনে উপলব্ধি করেছেন:

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।

('কড়ি ও কোমল' "প্রাণ")

সেখানে, পরিণত বয়সে অধ্যাত্ম জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে কবি বলেন:

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

('নৈবেদ্য' "৩০ সংখ্যক কবিতা")

তিনি বস্তু-জগতের সবকিছুর উপরে মানুষকে ভেবেছেন এবং মানুষের মহিমার জয়গান করেছেন। 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের প্রথম দিকের কবিতাগুলো প্রার্থনা সংগীত আর এর মধ্য দিয়ে আত্ম সমর্পণ করার আকুতি ফুটে ওঠেছে। প্রভুর পায়ে সমর্পন করে নিজেকে, নিজের আত্মার মহিমা উপলব্ধ করেছেন এবং সত্য-সন্ধানী হয়ে সত্যের কঠিন মূর্তিই দেখতে চেয়েছেন এবং জাগ্রত হৃদয়ে বলিষ্ঠ দেহ-মনে অন্তর্যামীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

'উৎসর্গ' কাব্যে কবি মানুষকে এই বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব ও অধ্যাত্মলোকের মাঝে সেতু বন্ধনকারী হিসেবে তুলে ধরেছেন। অসীমের অন্বেষণে কবি সৃষ্টি ও স্রস্টার মধ্যে সম্পর্কের রহস্যের জাল ভেদ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা মানবতাবাদকেই তুলে ধরে। কবি বিশ্ব মানুষের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য অন্তর-জগতে যে এক নতুন জীবন-যাত্রার সূচনা করেছিলেন তার আভাস ফুটে উঠে এভাবে:

বাহির হইতে দেখোনা এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে।
আমায় পাবেনা আমার দুঃখ ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।

('উৎসর্গ' "২১ সংখ্যক কবিতা")

মানবিক চেতনায় সচেষ্ট কবি তাঁর মানবতাবোধ দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বের মানুষ একই সুত্রে গাঁথা, পরম আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ আর সেটা তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন।

কবির জীবনের রহস্য জানার জন্য, তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলোকনের জন্য, 'খেয়া' কাব্যের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ সুখ ও দুঃখের মধ্য দিয়েই তার জীবন সাঙ্গ করে। 'খেয়া' তে তিনি অন্তরাত্মা দিয়ে অন্তরজীবনের আর বাইরের সত্তা দিয়ে বহির্জগতের চিত্র তুলে ধরেছেন এবং দুই ভিন্ন জীবনেরই পরিচয় দিয়েছেন। 'খেয়া'র অনেক কবিতায় বিষাদ তুলে ধরেছেন তিনি এখানে বুঝাতে চেয়েছেন এই কর্মময় জীবনের বাইরেও এক সুন্দর অধ্যাত্মজীবন রয়েছে তাই খেয়া পাড়ি দিয়ে শেষোক্ত জীবনে প্রবেশ করতে না পারলে জীবনের সার্থকতা নেই, তৃপ্তি নেই, জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অধ্যাত্ম জীবন বা ওপারে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন খেয়া, নিরবে নিভৃতে তিনি এই উপলব্ধিই করেছেন এবং পরমেশ্বরকে সত্যের আলোক শিখায় দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন:

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবর গেছে পারে;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না,
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরাল সাঁঝের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়।

('খেয়া' "শেষ খেয়া")

এখানে কবি আসলে খেয়া পার হওয়ার কথা বলেছেন এবং অপেক্ষার প্রহর গুণার চিত্রই তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে কবির জীবনদর্শন ও মানবতাবাদই প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথ যে মানবাত্মার মুক্তির কথা, বিশ্বমানবতার কথা, মানবাত্মার জয়ের কথা বলেছেন তা পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠেছিল তাঁর 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' কাব্যে। তাঁর কবিচিত্তের অনুভূতিতে মানবাত্মা ও মানবসম্বন্ধকে উপলব্ধি করেছেন, একই সাথে তিনি ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় লীলা অবলোকন করেছেন এবং এটা উপলব্দি করেছেন মানুষ ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সত্তা এবং ঈশ্বর মানবজীবনের মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করেন। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার প্রার্থনা যেমন আছে তেমনই ঈশ্বরের পথ চাওয়াতে আনন্দও আছে, এ পথ পানে চেয়ে থাকার ভালো লাগা, এই অপরিসীম ব্যাকুলতা, অধীর প্রতীক্ষা 'গীতাঞ্জলি'তে ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে;
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

('গীতাঞ্জলি' "২৮ সংখ্যক কবিতা")

'অহং' মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার মাঝেই তিনি মানবজীবনের কল্যাণ ও মুক্তি খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছেন বলেই তিনি বলেন:

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাইতো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।

('গীতাঞ্জলি' "১৩০ সংখ্যক কবিতা")

মানবপ্রেমের কবি, প্রকৃতির কবি নানা ব্যঞ্জনায়, নানা চিত্তে, বিচিত্র রসে জীবনকে সাজিয়েছেন এবং 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলোতে বিরহ, ব্যাথা, বেদনা আবার 'গীতিমাল্য'র কিছু গানে বিরহ ও মিলনের মধুর সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। 'গীতিমাল্য'তে তিনি মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের গভীর অনুভূতি উপলব্ধি করেন। পরমাত্মার উপলব্ধি অনুভবের মাধ্যমে তাঁর আত্মকেন্দ্রিক মানবতাবাদ বৈশ্বিক মানবতাবাদের রূপ নেয়। মানবজীবনে পরমাত্মার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল মানুষকে মানবতার তীর্থে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাই তিনি এই মহামানব বা পরমাত্মার কাছে তাঁর আবেদনকে তুলে ধরেন এভাবে,

এই তোমারি পরশ রাগে
চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জন্মান্তর,
সুন্দর হে, সুন্দর।

('গীতিমাল্য' "১০২ সংখ্যক কবিতা)

জীবনের অর্থ ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন বলেই মানবজীবনের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজেছেন। তিনি জীবাত্মাতেই পরমাত্মার বাস বলে মনে করেন আর এজন্য বলেন:

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি
হৃদয়-পানে চাইনি।

('গীতিমাল্য' "৯২ সংখ্যক কবিতা")

কবি মনে করেন ঈশ্বর ও মানুষ সমমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ, কেননা মানুষ যেমন ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে চায় তেমনই ঈশ্বরও মানুষের ভালোবাসার মাঝে নিজের অস্তিত্বের খোঁজ পান। পরমেশ্বরের সাথে মানুষের এই শাশ্বত সম্পর্ক যেমন স্বচ্ছ তেমনই মধুর। এ সম্পর্ক নির্ণয়ে 'গীতালি'তে কবি বলেন:

ও আমার মন যখন জাগলিনারে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙলরে ঘুম
ও তোর ভাঙলরে ঘুম অন্ধকারে।

এভাবে 'গীতালি'র প্রায় সব গানেই শান্তি ও সার্থকতা বাণীর সুর প্রবাহিত হয়, ঈশ্বরের মাহাত্ম্য এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যধারার বর্ণনা প্রকাশিত হয়। তিনি প্রেমের আকর্ষণে ঈশ্বরকে জাগাতে চেয়েছেন, পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, সুদৃঢ় মনে তাই ঈশ্বরকে আহ্বান করেছেন। তিনি সগর্বে বলে উঠেন:

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমরি হউক জয়।

('গীতালি' "১০১ সংখ্যক কবিতা")

কবি 'গীতাঞ্জলি, 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালির' বিভিন্ন গানে ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তার এসব বিষয়ই 'বলাকা' কাব্যে ছায়াপাত ঘটেছে। তিনি মানুষকে বিশ্বজনীন মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান এবং মানবজীবনের গভীর তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে বিশ্বজনীন মানবতাবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থলে চিরমানবের আলো অবলোকন করেন। তিনি মানবজীবনের সকল হতাশা, নিরাশা, ব্যর্থতা ও গ্লানি এই বিশ্বজনীন মানবতাবাদের মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করেছেন। এবং মানবজীবনের এই চিরসত্য তুলে ধরেছেন এভাবে:

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন পার হতে কোন পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।

('বলাকা' "৩৬ সংখ্যক কবিতা")

এভাবে তিনি দেশকালের অতীত এক মানবধর্মের প্রচার করলেন যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসী এর আলোকছটায় নিজেকে আলোকিত করতে পারে, এবং নিঃস্বার্থ কর্মে নিয়োজিত হতে পারে।

কবি তাঁর 'পলাতকা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় এই জগতের মানুষকে হৃদয়ের আপন আত্মীয় হিসেবেই পরিচিত করেছেন, মানবমনের অন্তর্লোকের রহস্য উদঘাটন করেছেন, তাছাড়া মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন ও বিরহের মধ্য দিয়ে আত্মার যে বন্ধন তা এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবি বলেন:

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্য-ডোবার বেলায়,
তাদের হাতে তুলে দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো-
ব'লে নে ভাই, এই যে দেখা, এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি নিয়েছি বিদায়।
এই তো ভালো ফুলের সঙ্গে আলোর জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নতুন প্রাণের আশায়।

('পলাতকা' "শেষগান")

এই কাব্যের "মালা", "কালো মেয়ে," এবং "হারিয়ে যাওয়া" এসব কবিতাতেও মানবতা লক্ষ্য করা যায়।

কবির মানবপ্রীতি মূলত মানবের মাঝে বেঁচে থাকার জন্য, মানবপ্রেমিক হিসেবে বিশ্ববাসীকে সকল স্বার্থমগ্নতা দূর করে বেঁচে থাকার যে আকুতি তিনি জানিয়েছেন তা এক উদার সাম্যবোধের দিকেই

পরিচালিত করে। আর এসব বিষয় কবির পরবর্তী কর্মেও ফুটে উঠে। এই পরিচয় পাওয়া যায় 'পূরবী' কাব্যেও। প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের চেতনায় কবি জীবন সায়াহ্নে এসে যৌবনের সেই প্রাণচঞ্চল, মধুময় উচ্ছ্বলতা ভরা দিনগুলো অনুভব করেন। 'বকুলবনের পাখি' কবিতায় যাত্রার নিশ্চয়তার সাথে মর্ত্য জীবনের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পূর্বস্মৃতি ও দূরে যাওয়ার ফলে যে বেদনা তার চিত্র তুলে ধরে কবি বলেন:

শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি।
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি,
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি।
কিছু কি থাকে না বাকি।
বালক গিয়াছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায়নি কোথাও বয়ে ?

('পূরবী' "বকুলবনের পাখি")

কবির হৃদয়মনে যে বেদনা জেগেছে তা তাঁর লেখায়, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে নন্দিত হয়েছে। তিনি মানবের অপরাজেয় বীর্যে বিশ্বাস করতেন, জীবনের বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি জীবনের প্রকৃত অর্থ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন। তিনি মনে করেন, মানবতার আদর্শ যদি মানুষ মনে ধারণ করতে পারে তবে তার মৃত্যু নেই। সেজন্য তিনি শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলোর মধ্যে আগের কাব্যগুলোর তুলনায় আরো প্রবল উচ্ছ্বাসে ও স্বচ্ছরূপে মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনা করেন।

কবি আত্মবিশ্লেষণের ও আত্মপরিচয়ের কাব্য 'পরিশেষ'এ কবি-মানসের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যের মধ্য দিয়ে কবি অসীম ও মানবের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেন। তিনি নিজের পরিচয় সম্পর্কে বলেন এভাবে

" শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই , আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।"

('পরিশেষ' "পান্থ")

এভাবে তিনি 'পরিশেষ' কাব্যে মানব মন্দিরে নিজের অর্ঘ্য সমর্পণ করে নিজের মধ্য দিয়ে সকল মানবসত্তার গভীরে এ অভিজ্ঞতা পৌছে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, নিজের মধ্যে দেবসত্তাকে যদি এই বিশ্ববাসী উপলব্ধি করতে পারে তবেই তাদের মুক্তি আসবে এবং প্রতিটি মানব হৃদয়ের উচিত এই মহামানব পাওয়ার জন্য-সাধনা করা। 'পরিশেষ' কাব্যের মধ্যে দিয়েই কবি জগৎ ও জীবনে অভিব্যক্ত যে অসীম আনন্দময় সত্তা আছে তার অনুভববের পাশাপাশি অসীমকে তিনি মানবের হৃদয়বিহারী আত্মা হিসেবে বিবেচিত করেছেন। এভাবে কবি 'বীথিকা' কাব্যে ও দৃশ্যমান দেবীর মধ্য দিয়ে দেবতা বা মহামানবকে উপলব্ধি করেছেন। বিশ্বজীবনের প্রেম ও অনুরাগ, জীবন ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও প্রলয়ের মাধ্যমে জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করেছেন। এখানের প্রত্যেকটি কবিতায় ভাব-গভীরতা, ব্যক্তি জীবনের ছায়া, বিশ্বসত্তার সুগভীর স্পর্শানুভূতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। মুক্তিকামী, দীপ্তিকামী কবি দেবতার উদ্দেশ্যে 'বীথিকা' কাব্যে বলেছেন:

... তবু যে তো তাহারি উদ্দেশ্যে
একদা অর্পিয়াছিনু স্পষ্টবাণী, সত্য নমস্কার
অসঙ্কোচে পূজা অর্ঘ্য
সেই জানি গৌরব আমার।

('বীথিকা' "বিহবলতা")

তাঁর চিত্তের আকুতি প্রসারিত হয়েছে জীবনের রহস্য ভেদ করার মধ্যে, বিশ্বসত্তার প্রাণপ্রাচুর্য ও জীবন-চাঞ্চল্যকর বিচিত্র রূপ অবলোকনের মধ্যে এবং তাঁর চিত্ত শান্ত-স্তব্দ, মৌন-গভীরতায়, তপস্যায় গভীর নিরবতা দিয়ে মহামানবকে অনুভব করতে চেয়েছে। এরপর 'পুনশ্চ' কাব্যের "মানবপুত্র" "শিশুতীর্থ" "তীর্থযাত্রী" এসব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানবতার জয়গান করেছেন, মানবধর্ম সম্পর্কে বলেছেন। এবং তিনি 'পুনশ্চ' কাব্যে সগৌরবে ঘোষণা করেন:

...জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের , ওই চিরজীবিতের।

('পুনশ্চ' "শিশুতীর্থ")

মানুষের অন্তরে তিনি পূর্ণমানবের সন্ধান করেছেন। এসব কাব্যের মধ্যে অধ্যাত্ন-জীবন, সৃষ্টি, রহস্য, মানবসত্তা ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন এবং মানুষের অন্তরের গভীরে এক সূত্রে গ্রথিত পূর্ণমানবের আলোকেই মানবতাবাদ তথা বিশ্বমানবিকতার ধারণা দিয়েছেন।

'শেষ সপ্তক'এর বিভিন্ন কবিতায় মানবসত্তার চিরন্তন অভিযানের অনুভূতি, গভীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কবির অপূর্ব কল্পানোভূতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দৈনন্দিন জীবনের সকল

কর্মে মানবসত্তার অভ্যন্তরে এই মহামানবকে উপলব্ধি করেছেন। কবি তাঁর জীবন ও কাব্যে যে মানবতাবাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অনুভব করেছেন তাঁর আলোকই মনের মন্দিরের মহাপুরুষ, পূর্ণ মানব তথা মহামানব ও মনের মানুষকে অর্ঘ্য দান করেছেন। মানবজীবনে পরম শান্তি কামনায় অন্তরতম আনন্দে এই মহামানব সম্পর্কে বলেন,

... আর বেশিকিছু নয়।
আমি আলোর প্রমিক;
প্রাণ রঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।
পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া।
দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।

('শেষ সপ্তক' "৬ সংখ্যক কবিতা")

কবি মনে করেন, অসীম বাইরের জগতের কোন সত্তা নয় প্রকৃতির মধ্যেই একে পাওয়া যায় এবং ভক্তি, প্রেম ও কর্মের মাধ্যমে জীবন দেবতাকে মানুষই আবিষ্কার করে। আর তাই বিশ্বমানবতার কবি অসীম ও সসীমের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্র ধরে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন, সসীমের মধ্যেই অসীমকে লাভ করতে চেয়েছেন। পূর্ণমানবের ধারণা দিয়ে তিনি দেশকাল অতিক্রম করে বৈশ্বিক মানবতার বাণী ছড়িয়ে দিলেন যা মানুষের বুদ্ধিকে শাণিত করে, মানুষকে আলোর পথের দিশারী হিসেবে গড়ে তুলে এবং মানুষকে সর্বজনীন মানবতায় অনুপ্রাণিত করে নিঃস্বার্থ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কবি এই বিশ্বমানবিকতা অর্জন করার জন্য সকল মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার মহিমা ঘোষণা করে বলেন:

... যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে
সেই শশ্মানচারী ভৈরবের পরিচয়ে জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায় ;
শুধু রেখে গেলেম নত মস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশ্যে
মর্তের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

('পত্রপুট' "১২ সংখ্যক কবিতা")

এভাবে কবি গভীর মননশীলতার মধ্য দিয়ে জীবন ও সৃষ্টির মূলসূত্র সম্পর্কে 'পত্রপুট' র গদ্য কবিতায় এক অভিনব কাব্যরূপ দিয়েছেন। বিশ্বজনীন মানবতাবাদের ডাক দিয়েছেন, মানবিক বিশ্বের বাইরে তাঁর মতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আর মানবিক বিশ্বে মানুষের মানবিক মূল্যায়নই তাকে সার্থক ও যথার্থ

হিসেবে গড়ে তুলে বলে তিনি মনে করেন। সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষই অনন্য বলে মানুষ ছাড়া সৃষ্টির কোনো মূল্য থাকতে পারে না। এজন্য 'শ্যামলী' কাব্যে বলেন:

... এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন বিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না-না-পান্না, না-চুন্নি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলে 'আমি'।

('শ্যামলী' "আমি")

কবি মানব অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই মানবিক বিশ্ব ছাড়া অন্য কিছুর কোনো মূল্য নাই তার কাছে। তিনি নিজেকে ত্যাগ করার মধ্যেই সেই মহান পুরুষ বা 'আমি' বলে যে সত্তা আছে তা উপলব্দি করতে চেয়েছেন।

কবির জীবনের শেষদিকের কাব্যগুলোতে 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখা'তেও জ্যোতির্ময় সত্তা, মানবমহিমায় প্রবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রকৃতি প্রেম ও মর্ত্যপ্রেম গোধূলিবেলার এসব কাব্য-কবিতায় নিরাসক্তির মধ্যেই মধুময় ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায়ের দুঃসাহস করেন এবং দৃশ্যমান জগৎ ও প্রকৃতির উদ্দেশ্য বলেন:

... এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

('প্রান্তিক' "১৪ সংখ্যক কবিতা")

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে, লোকালয় ও জীবলোকের মাঝে যথার্থ মুক্তি খুঁজেন। 'প্রান্তিক'এ কবি-মানসের যে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তা তাঁর 'সেঁজুতি' কাব্যেও দেখা যায়। এই কাব্যের "জন্মদিন" কবিতায় তিনি আত্মজীবনের গভীরতা বিশ্লেষণ করেছেন এবং অনিত্যের মাঝে নিত্যের সন্ধান করেছেন। এই কবিতায় জীবনের প্রতি গভীর প্রেমের মধ্যে দিয়ে জীবনমৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে কবি এক জ্যোতির্ময় সত্তার সন্ধান পেয়েছেন যার স্পর্শে নিজেকে চেতনার আলোকে জাগ্রত করেছেন। কবির

জগৎ ও জীবনের প্রতি যে নিবিড় দৃষ্টি আছে তা প্রসারিত করেছেন এই সত্তার মধ্যে এবং আত্মার জয় ঘোষণা করে বলেন,

... ... আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন, মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

('সেঁজুতি' " জন্মদিন")

কবি সংসার জীবনের প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির মূল্যায়ন এবং বিশ্বসত্তার মধ্যে তাঁর অন্তরতম সত্তার অবস্থান বিষয়ে এখানে লিখেছেন। কবি পৃথিবীতে মানবতার বিপর্যয় দেখে, মনুষ্যত্বের অবমাননা সহ্য করে, সাম্রাজ্যবাদীর ভয়ংকর রূপ পর্যালোচনা করে মানুষের প্রাণশক্তির অভাববোধ করে এই কাব্যে বিভিন্ন কবিতা লিখেন।

কবি 'নবজাতক' কাব্যের "কেন" কবিতায় বিশ্বসৃষ্টি ধারার রহস্য চিন্তা করেছেন। তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রাকারে ঘুরার দৃশ্যে এক সত্তা অনুভব করেছেন, যা এর কেন্দ্রে রয়েছে এবং 'আমি' নামে সত্তার উদ্ভব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন।

জীবনসায়াহ্নে মানবতাবাদী কবি তাঁর কল্পনায় এমন এক মহামানবের আর্দশ চিত্রিত করেছেন এই আদর্শের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সংকট দূর হবে বলে তিনি মনে করেন। এজন্য তিনি মহামানবকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন
আজি অমরাত্রির দুর্গ তোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।

জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠল মহাকাশে।"

('শেষলেখা' "৬ সংখ্যক কবিতা")

কবি বিশ্বাস করেন মর্ত্যের মানুষের মাধ্যমেই মানুষের প্রতি মানুষের রাগ, ক্ষোভ, নির্যাতন একদিন শেষ হবে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্য দিয়ে মানুষের সকল সংকট দূর হয়ে যাবে, দুঃখ- দুর্দশার অবসান হবে বলে তিনি মনে করেন। আর কেবল মহাপুরুষদের মধ্যেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে সুসজ্জিত, আলোকময়, গৌরবদীপ্ত ও বৃহৎ যে অংশটি আমাদেরকে মুগ্ধ করে ও বিমোহিত করে তা হলো কাব্য। তিনি তাঁর কাব্যসাধনার দ্বারা মানবজীবনের নিগুঢ় অর্থ, রহস্য, ও সৌন্দর্য অবলোকন করতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্য সাধনার মূলে ছিল মানুষের সাথে বিশ্বভাণ্ডার ও ব্রহ্মের সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধকে জাগিয়ে তোলা। তাঁর মানবতাবাদের মূলে ছিল ব্যক্তিমানব বা জীবাত্মা যা জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতার পথে ধাবিত হচ্ছে, এবং এই জীবাত্মা এক মহৎ পরিণামের আদর্শে মানবজীবনের প্রতিটি কালে তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে একটি অখণ্ড মানব-চেতনা হিসেবেই বিরাজ করে।

তিনি মনে করেন মানুষ অসীমের সাথে মিলিত হতে চায় এবং কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়েই অসীমকে লাভের মাঝে সার্থকতা খোঁজে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন " Man is true, where he feels his infinity, where he is devine, and the devine is the creator in him." [১৮] সসীম ও অসীমের মাঝে মধুর সম্পর্ক নিরূপন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসাধনায় মূলত মানবতাবাদেরই সুর তুলে ধরেছেন।

৪.২ রবীন্দ্র ছোটগল্পে মানবতাবাদ

ছোটগল্প বলতে ঠিক যা বুঝায়, বাংলাসাহিত্যে তার সূচনা মূলত রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই। সামাজিক সমস্যা, রাজনীতি, মানবমনের বিচিত্র ভাবনা নিয়ে তাঁর ছোট গল্প সমূহ রচিত। তিনি মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে বাস্তবতার আলোকে জীবনের সুখ-দুঃখ, পাওয়া- না পাওয়া, আনন্দ-বেদনা কে জীবনের গভীরতম উপলব্ধি দিয়ে ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। ছোটগল্পকে গণমুখী করে তুলতে তাঁর ভূমিকা

অনন্য, তিনিই বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে পরিচয় করে দিয়েছেন। শ্রেষ্ট গল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ছোটগল্পে মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সন্নিবেশে দুঃখ-বেদনা, সুখ-আনন্দের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্প বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গীতিকবিতার মতো।

তিনি প্রকৃতির সাথে পরিপূর্ণ একাত্মবোধ পোষণ করেন, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে ছন্দের আকারে তুলে ধরেন, মানুষের প্রতি অপূর্ব শ্রদ্ধা নিবেদনের সাথে নিজেকে অপরিসীম প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে নারী সমাজের ব্যক্তিস্বাধীনতা, পূর্ণ মর্যাদা ও মহিমার কথা বলেছেন তাঁর ছোটগল্পগুলোতে। আমাদের পুরষশাসিত সমাজে নারীর অবহেলা ও অবমাননার বিরুদ্ধে নারীর মুক্তিপথের বিভিন্ন অন্তরায় তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। তাঁর সময়ে সমাজে পণপ্রথা, বিধাব বিবাহে অনাগ্রহ ও বহুবিবাহের মতো নানা সামাজিক সমস্যা নারী জীবনকে অসহনীয় ও সংকটাপণ্ন করে তুলেছিল।

তিনি নারীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও মুক্তি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নিষ্ঠুর সমাজের শাসন থেকে নারীকে মুক্তি দিতে তাঁর ছোটগল্প 'ঘাটের কথা'য় সন্ন্যাসীর স্ত্রী কুসুমের বঞ্চিত জীবনের হাহাকার তুলে ধরেছেন। এখানে নারীর অবমাননার স্বরূপ ও তার অন্তর্বেদনার রূপ ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' গল্পে নির্ধারিত পণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ এক নারীর নির্যাতন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে তিনি নারীর লাঞ্চিত সত্তার সন্ধান দিয়েছেন এবং হৃদয়হীন এক পণ-প্রথার চিত্র তুলে ধরেছেন। নবযুগের সূচনা ঘটাতে নারীর জাগরণ তথা মানুষের জয়গান করে নারীমুক্তি আন্দোলনে নারীর সকল অপমান দূর করার জন্য তিনি এক দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলেন। নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে, তাঁর লেখনীতে নারীকে কেন্দ্রিয় চরিত্রে উপস্থাপন করার মাধ্যমে নারীমুক্তি তথা মানবতার গান গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' গল্প এ নারীমুক্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নারী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প তাঁর জীবনে অন্য রকমের এক সংগ্রাম ছিল।

'পোস্টমাস্টার' তাঁর প্রথমদিকের গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। ছিন্নমূল শ্রেণীর প্রতি কবির সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্প 'পোস্টমাস্টার'এ। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে স্বজন থেকে দূরে, এক নিভৃত গ্রামে দরিদ্র 'পোস্টমাস্টারের' জীবন প্রথম প্রথম নির্বাসন তুল্য মনে হয়। দরিদ্র পোস্টমাস্টার

মাঝে মাঝে একা-একা ঘরে বসে একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তির সঙ্গ কামনা করেছেন। এই কামনাটুকু এই গল্পে সুন্দরভাবে উপস্থিত হলেও একটি করুণরূপ নিয়েছে। পিতামাতাহীন রতনকে ছেড়ে যেতে মন না চাইলেও সমাজের করুণ বাস্তবতায় পোস্টমাস্টার রতনকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। এই গল্পটিতে বিদায় বেলায় রতনকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়ে পোস্টমাষ্টারের হৃদয়ে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা লেখক পোস্টমাষ্টারের অনুভূতির মধ্য দিয়ে বলেন, "একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি, . . . কিন্তু . . . উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী।" এই গল্পে পোস্টমাষ্টার ও রতনের মধ্যে যে বেদনা ও দুঃখের পরিসমাপ্তি হলো তার প্রতিটি পরতে পরতে এমন এক অপূর্ব সুরের জগৎ সৃষ্টি হলো যা শুধু মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটায়।

মনুষ্যত্বের লাঞ্চনার বেদনাকে মূর্ত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্বিতা' গল্পে। এখানে সত্যনিষ্ঠ ধর্মভীরু মানুষের মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে এবং মনুষ্যত্বের এমন অবমাননা ও উপেক্ষার অসহায় বেদনা রামকানাইয়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'ত্যাগ' গল্পে মানব হৃদয়ের ধর্ম ও সমাজধর্মের মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই গল্পে প্রতিহিংসাপরায়ণ প্যারিশংকরের চক্রান্তে ব্রাহ্মণ সন্তান হেমন্ত কায়স্থকন্যা বাল্যবিধবা কুসমকে বিয়ে করেছিল। হেমন্ত নিজের অজ্ঞাতেই এই বিয়ে করেছিল। হেমন্তের হৃদয়ে কুসুমের জন্য গভীর ভালোবাসা ছিল, হেমন্তের কাছে যখন কুসুমের প্রতি ভালোবাসা এবং সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখন ভালোবাসার অসীম শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে, নিজের ভালোবাসার সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে কুসুমকে আঁকড়ে ধরলো, এই দ্বন্দ্বে হৃদয়েরই জয় হলো। কুসুমকে হেমন্ত ত্যাগ করলো না বরং পরিবার এবং সমাজকে ছেড়ে সে বেরিয়ে গেলো। এখানে রবীন্দ্রনাথ মানবতার, মানবসত্যের জয় ঘটালেন।

রবীন্দ্রনাথ 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে বিশ্বচেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে দ্বিধাহীন, নিঃস্বার্থ ও উদার মানব প্রেমের অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র রহমত আফগানিস্তান থেকে মেওয়া বিক্রি করার জন্য কলকাতায় আসে। জাতিধর্মের সকল বাধা অতিক্রম করে মানবীয় প্রেমের এক অপরূপ রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। পর্বতগৃহবাসিনী কন্যা মিনির প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

যে ভালবাসা, যে পরম স্নেহ রহমত দেখিয়েছেন তা মানবতাবাদেরই চিত্র। প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতায় প্রতিটি মানুষই সমান, এখানে যে কোন জাতিভেদ নেই তা 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে ফুটে উঠেছে। 'কাবুলিওয়ালা' রহমত পিতার চোখেই মিনিকে দেখতেন, জগতের সকল পিতার মতো তিনিও পিতা তাই মিনিও সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দু পিতার সন্তান হয়েও তার পিতার সাথে 'কাবুলিওয়ালা'র কোনো পার্থক্য করেনি।

তিনি 'সুভা' ও 'ছুটি' গল্পে প্রকৃতি ও মানুষকে একাত্মা হয়ে যাওয়ার কথা বলেন। 'সুভা' গল্পের সুভা এবং 'ছুটি' গল্পের ফটিক যেন প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে গেছে। সুভা বোবা হলেও প্রকৃতি তাঁর মনের কথাগুলো প্রকাশ করে, নদীর কলতান, মানুষের কোলাহল, পাখির কিচিরমিচির ডাক এসবকিছুর মাঝেই তার আবেগ যেন প্রাণ খুঁজে পায়। এখানে বালিকা সুভার চিরনীরব হৃদয়ের মাঝে যে অসীম অব্যক্ত কান্না বেজে উঠে তা অন্তর্যামী জানেন। 'ছুটি' গল্পে যেখানে প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা ফটিক আনন্দ-খুশিতে ভরপুর ছিল, সেই প্রকৃতির আনন্দ থেকে ফটিককে কলকাতার বন্দীশালায় আটকে রেখে তার সকল আনন্দ কেড়ে নেওয়া হয়। ফটিক এই বন্দীশালায় জল-মাপার শব্দে ছুটির ডাক শুনতে শুনতে নবান্নের গন্ধভরা আকাশে হারিয়ে গেলো। এভাবে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে। জীবনের বহু বিচিত্র লীলার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরকে মিলিত করে 'সুভা' ও 'ছুটি' গল্পে লেখক মানবতাবাদের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

তাঁর অন্যতম ছোটগল্প 'শাস্তি'তে নারীর যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, মহিমা ও আভিজাত্য রয়েছে তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গল্পের শেষাংশে চটপটে, চঞ্চলা ও মিষ্টি গ্রাম্যবধু-চন্দরার অভিমানভরা স্বাধীন আচরণ ও চন্দরার অভিব্যক্তির মধ্যে এক নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা ফুটে উঠে। পুরুষশাসিত সমাজে পদদলিত হয়ে, অবহেলিত হৃদয়ে, নিষ্ঠুরতার স্বীকার হয়ে নারীজীবনের অভিশাপ, অপরিসীম বেদনার ভার বুকে পাথরের মতো চেপে রেখে চন্দরা এই নির্মম পৃথিবী থেকে চলে গেলো। আমাদের সমাজে পুরুষ মানুষ কর্তৃত্বপরায়ণতা, নিষ্ঠুর মনোভাব এবং এক কৃত্রিম অধিকার ফলিয়ে নারীকে দমিয়ে রেখেছে, নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেছে, নারীর ব্যক্তিসত্তার অবমূল্যায়ন করেছে, নারী হিসেবে নারীর আলাদা ও অনন্য সত্তাকে অস্বীকার করেছে। আর রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টির মধ্য দিয়ে 'শাস্তি' গল্পে নারীর দুর্বিষহ লাঞ্ছনা, চাপা কান্না, অপরিমিত দুঃখের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পুরুষের মতো নারীরও যে আলাদা মানুষ, তারও মূল্য রয়েছে, এবং নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিকাশের মৌন দাবি

জানিয়েছেন এই বিশ্বদরবারে। মনুষ্যত্বের মূল্যায়ন কামনা করে সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিতে মানুষের হৃদয়ের প্রবলতম সত্তা ও বৈশিষ্ট্য প্রেম, যা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে আবেগ ও অপূর্ব রসে পরিপূর্ণ করেছে তার উল্লেখ করেছেন। মানুষের জীবনে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলে তিনি এক অদ্ভূত অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এই গল্পে হরসুন্দরীর মনে প্রবল আনন্দ ও স্বামীর প্রতি তীব্র প্রেমের উদয়ের ফলে সে এক আত্মবিসর্জনের মতো নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য নিজের মূল্যবান ভালোবাসাকে ত্যাগ করে পুত্রহীন স্বামীকে জোর করে বিবাহ দিয়ে পরবর্তীতে নববধু শৈলবালাকে স্বামীর কাছে প্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এখানে প্রেমের সজাগ অনুভূতি তিনটি প্রাণীর জীবনে তিন রকমভাবে ধরা দিয়েছে। হরসুন্দরীর হৃদয়ে যে মানবিকতা আছে রবীন্দ্রনাথ তা এখানে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে হরসুন্দরীর হৃদয়ে স্বামীর প্রতি প্রেম ছিল বলেই সে স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে আগ্রহী ছিল। নিজের অন্তরের সমস্ত দুঃখকে চাপা দিয়ে এত বড় আত্মবিসর্জন শুধুমাত্র মানবতার জন্যই সম্ভব হয়েছে।

মানবতার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পেও। স্নিগ্ধ মধুর প্রেমের গল্প হিসেবে এখানে প্রকৃতি-রহস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দুরন্ত চঞ্চলা কিশোরী মৃন্ময়ীকে ধরে বেধে বিয়ে দেয়া হলে প্রথম দিকে তার বিদ্রোহী মন এসব তিরোয়া নিয়ম কানুন মানতে না চাইলেও পরবর্তীতে অপূর্ব যখন তার অদ্ভূদ আচরণে বিরক্ত হয়ে তাকে বাপের বাড়ী রেখে আসে এবং কলকাতা চলে যায় তখন মৃন্ময়ীর মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন আসে। হঠাৎ করে সে বাল্যজীবন থেকে যৌবনে পদার্পণ করলো, এ যেন অন্যরকম পরিবর্তন, আরেক অনুভূতি, এক সোনার কাঠির স্পর্শ এবং এই স্পর্শ অনুভূতিটি রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে মনোরম করে ফুটিয়ে তুলেছেন অর্থাৎ দুরন্ত চঞ্চলা নারী মৃন্ময়ী অপূর্বের প্রেমের সাথে কিভাবে নারীত্বের মধ্যে জেগে উঠলো তার একটি সহজ, সুন্দর, সাবলীল, অসামান্য-মমতা এই গল্পে ফুটে উঠেছে। আর এটা প্রকৃতি-লীলারই কাহিনী, তাই এখানে প্রেম ও নারীত্বকে জাগিয়ে তুলে কবিগুরু এক সুন্দর ও মনোরম মানবতার পরিচয় দিয়েছেন।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে দুটি প্রধান চরিত্র শশিভূষণ ও গিরিবালার মধ্যে যে স্নেহ-ভালোবাসার শুদ্ধ পবিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পরবর্তীতে এই সম্বন্ধটি সকরুণ বিচ্ছেদ-ব্যথায় সমাপ্তি লাভ করেছে।

এতে সমস্ত মন ব্যথিত হয়ে যায়। ইংরেজ-পদদলিত, অবহেলিত ও শোষিত বাঙলার দুঃসহ বেদনা রবীন্দ্রনাথ এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই বৈষম্যের চিত্র অংকন করে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এখানে তিনি স্বদেশ ছাড়িয়ে পুরোবিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন এবং আত্মমর্যাদা জাগাতে বিশ্বপিতার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছেন যা মানবতাবাদের সুরই বহন করে।

'খাতা' গল্পের নায়িকা বালিকা বধূ উমা পড়ালেখায় আগ্রহ দেখালে তার শিক্ষিত স্বামী তাকে পদে পদে বিড়ম্বিত করেছে, অবহেলার চোখে দেখেছে। এখানে লেখক পুরুষশাসিত সমাজে কৃত্রিম অধিকার ফলিয়ে নারীকে দমিয়ে রাখার যে প্রবণতা তা দূর করার মৌন দাবি জানিয়েছেন।

'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে ধর্মের নামে ও জাতিভেদের যে সংকীর্ণতা দেখা যায় তার প্রতি কঠোর প্রতিবাদ তুলে ধরা হয়েছে। মানবতাবাদী সাহিত্যিক হিসেবে এই গল্পে তিনি জাতীয় চেতনা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি সবসময় জীবনকে সকল রাজনৈতিক আলোড়নের উর্ধ্বে এবং জীবনের সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করেই কেবল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সম্ভব বলে মনে করেন।
তাঁর রচিত 'বিচারক' গল্পে সামাজিক বিবেচনাহীনতার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়ার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে তিনি মানবিকতার পক্ষে লিখেছেন এবং সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের অবহেলাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে নিজেকে বিচারকের আসনে বসিয়ে এই ঘুণে ধরা, বিবেকহীন নষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে ও মানবিকতার পক্ষে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন। একই ভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানভঞ্জন' গল্প জুড়ে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার বিকাশের দাবী জানিয়েছেন। গল্পের নায়িকা গিরিবালা স্বামীর কাছে একান্তভাবে অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং পরিশেষে স্বামীর মনের প্রাচীর ভেঙ্গে বাহির হয়ে নিজের বিদ্রোহী শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজটীকা' গল্পটি স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত যেখানে জাতীয়তাবাদের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এ গল্পে পরাধীন বাঙালির ইংরেজদের প্রতি যে মোহ রয়েছে তা কটাক্ষ করা হয়েছে। 'রাজটীকা'তে লেখক যেসব বাঙালিদের মধ্যে দেশপ্রীতির চেয়ে ইংরেজপ্রীতিই প্রাধান্য বিস্তার করে এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষদের আক্রমণ করেছেন। লেখক এখানে রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে বিরাট বৈষম্য আছে সেটা ত্যাগ করার কথা বলেছেন। এই গল্পে তিনি মানুষের মনুষ্যত্ব জাগাতে, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে এবং দেশপ্রীতি জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের আদর্শটি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে দেশি আমলাদের

হৃদয়হীনতার বিষয়টি এবং নির্লজ্জ লোভের জ্বলন্ত ছবির মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের নিষ্ঠুর বর্বরতাকে ধিক্কারে পরিণত করা হয়েছে। আইনের প্রতি অবহেলা, শাসিত শ্রেণীর প্রতি জুলুম এসব চিত্রই ফুটে উঠেছে। এসবকিছুই তাঁর মানবতাবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

'হৈমন্তী' গল্পে পুরুষ গল্পকথকের জবানিতে রবীন্দ্রনাথ পণপ্রথা কবলিত নারী জীবনের নিষ্ঠুর অবমাননা, অবহেলার করুণ পরিণতির এক চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে দেখা যায় হৈমন্তীর বাবা উদার মানসিকতার ছিলেন এবং হৈমন্তীকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন এজন্যই হৈমন্তী উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠেছে। এমন উদার শিক্ষায় ও নির্মল পরিবেশে বেড়ে উঠার কারণে হৈমন্তী অন্তর-বাহিরে সর্বজনীন মুক্তি অনুভব করেছে। প্রচলিত ধর্মের অনুসরণ না করে তার বাবা যে ধর্মপথকে অনুসরণ করেছিলেন তা হলো সর্বজনীন মানবতার ধর্ম। আর মানবতার ধর্ম চর্চার মাধ্যমে তিনি উদার জ্ঞান ও নির্মল সত্য লাভ করেছেন।

'বোষ্টমী' গল্পে সমাজধর্মের নামে যে অনাচার চলতো সেই বিষয়টির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছেন এবং নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পে গুরুবাদী রসলীলার প্রকাশ হয়েছে এবং পরমের রূপ সত্যকে খোঁজার এক আশ্চর্য প্রবণতা ছিল। গ্রাম-বাংলার সহজিয়া ভক্তিবাদের মধ্য-দিয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক মানবিক রূপের সন্ধান করেছেন। এই গল্পে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে, যে স্বাতন্ত্র্যের টানে নায়িকা আনন্দী ঘর ছেড়েছে সত্য অন্বেষণে।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের আভাস দিয়েছেন। তিনি নারীমুক্তির প্রসঙ্গ টেনে সমাজের অন্যায়-অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা, নানারকম বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। নারীত্বের প্রতি আমাদের সমাজে পারিবারিক জীবনের রোমান্টিক প্রেম ও শ্রদ্ধার অন্তরালে যে বৃহৎ বঞ্চনা ও লাঞ্চনা লুক্কায়িত আছে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই সামাজিক প্রবঞ্চনাকে গোপনতা থেকে বের করতে চেয়েছেন। নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। আবার, 'পয়লা নম্বর' গল্পে দাম্পত্য সম্বন্ধের বিশ্লেষণ করে এর গভীরে সামাজিক চেতনার বানী প্রকাশ করেছেন। গল্পে বুদ্ধিজীবী পুরুষের নিষ্ঠুর নিস্পৃহতা, কর্তৃত্বপরায়ণতা ও ক্ষমতার দ্বারা নারীর অসম্মান, অবমাননার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে, যা নারীকে অন্তর্বেদনায় পুড়িয়ে মেরেছে। এখানে নারীর অবমাননার স্বরূপ ও অন্তর্বেদনার রূপটির মধ্য দিয়ে রবী ঠাকুর মানবিকতা তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ তার 'নামঞ্জুর' ও 'সংস্কার' গল্পে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের কারণে হীনম্মন্যতার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। সেই সাথে হীনবর্ণভুক্ত মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। 'নামঞ্জুর' গল্পে দাসীকন্যা অমিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্র। এই গল্পে স্বদেশকে মুক্ত করতে দাসীকন্যা অমিয়াকে ব্রতধারিণী উচ্চশিক্ষিতা নারী হিসেবে চিত্রিত করে রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। দাসীমাতার গর্ভজাত অমিয়াকে উচ্চ সম্মান দিয়েছেন আবার তার নারীসুলভ দুর্বলতাকেও উদঘাটন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানবতাবাদের ভূমিতেই অমিয়া চরিত্রের জন্ম। আবার, 'সংস্কার' গল্পে লাঞ্ছিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি কবির সহানুভূতি সর্বত্র দৃষ্ট। জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও ধর্মহীনতা এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সবার উপরে মানুষকে স্থান দিয়েছেন এবং মানুষের মহিমার জয় ঘোষণা করেছেন।

'রবিবার' গল্পে নাস্তিক অভীক কুমারের ভালোবাসার পাত্রী বিভার নানা কাজের মধ্যে একটি হলো বচ্চু বেহারার রোগতাপের তদবির করা। বিভা অতি আধুনিক মেয়ে এবং সে নাস্তিক হলেও তার মধ্যে ভৃত্য-বাৎসল্য দেখা যায়। যা মানবতারই বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ অভীক চরিত্রের মধ্য দিয়ে সর্বজনীন মানবতার ধর্ম প্রচার করেছেন। আবার, 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নন্দকিশোর সামাজিক অর্থে ধর্ম স্বীকার করেননি এবং মোহিনীর মতো নিম্নবর্ণের মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করে বর্ণাশ্রয়ী সমাজের মানসিকতার বিরুদ্ধে মানুষের মনুষ্যত্ব, মহিমা কে বড় করে দেখিয়েছেন। এগুলো মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটায়।

'বদনাম' গল্পে সৌদামিনী অন্যায়-অবিচার, হৃদয়হীনতা ও বৈষম্য সহ্য করতে না পেরে অবশেষে বিদ্রোহ করেছে। এখানেও রবীন্দ্রনাথ নারীকে পুরুষের মতো মানুষ হিসেবে ভেবে নারীর মানবিক জীবন চেতনার পথে প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তোলার বিষয়ে বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'মুসলমানি গল্প'তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য জোরদার করার কথা বলেছেন। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ মানব ধর্মের উপর জোর দিয়েছেন এবং মানবতার প্রতি আকর্ষণই এই ছোটগল্পে তীব্র ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এভাবে ছোটগল্পে মানবতার যে সুর বেজেছে তা ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার উৎকর্ষ সাধনে পরম উৎকর্ষে আবেগ, ঐতিহ্য ও পূরাণের আলোকে আন্তঃমানবিকতা স্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, পরমসত্তার শ্রেষ্ঠ রূপই হলো বিশ্বমানবের রূপ। অসহায় ও

অবহেলিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও দরদই ছিল তাঁর মানবতার মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ মানবতার দৃষ্টিতে বিশ্বাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, এবং বিশ্বাত্মাকে অবলোকন করেছেন মানবকল্যাণে। তাঁর ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যকে আরো বেশী সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর গল্পে বাংলার মানুষ ও প্রকৃতির সাথে সাথে বিশ্ববাসীর কথাও উঠে এসেছে। তাঁর মহৎ সাহিত্যকর্মের মধ্যে ছোটগল্পের আবেদন বাঙালি পাঠকের কাছে চিরকাল অমলিন থাকবে।

৪.৩ রবীন্দ্র উপন্যাসে মানবতাবাদ

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনার পাশাপাশি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা। তাঁর সাহিত্যকর্মের একটা সাধারণ বিষয় হলো, প্রেম ও প্রতাপের সংঘাতে সবসময়ই প্রেম জয়লাভ করেছে। প্রেমের ধর্ম হলো তার নিজেকে অন্যের মাঝে বিলিয়ে দেয়া, সকল হৃদয়ের অনাবৃত উদার ভূমি বিচরণ করা। আর প্রতাপ সবসময়ই তার চারিদিকে স্বার্থ ও অহমিকার প্রাচীর খাড়া করে নিজেকে সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রেমের জয় হয়েছে এবং মানুষের হৃদয়ের মানবতা ও সাম্য চেতনার বাণী প্রচারিত হয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের দেখানো পথেই উপন্যাস যাত্রার সূত্রপাত করলেও দুজনার উপন্যাস রচনার কাল, প্রেক্ষাপট, সমাজধর্ম ও চেতনার ভিন্নতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সাথে মানবমনের গভীর আত্মীয়তাকে সম্পর্কিত করে, জীবনের অতীন্দ্রিয় রহস্যলোককে মানবমনের সাথে সুক্ষ্ম গভীর সমাহিত ভাবলোককে সম্পর্কিত করে উপন্যাস রচনা করেছেন। এজন্য তাঁর লেখা উপন্যাসে মানবমনের সুক্ষ্ম গভীর সম্পর্ক অন্তর্মুখী। মধ্য বিত্ত সমাজজীবনের স্বাভাবিক প্রবাহের ধারা রবীন্দ্র উপন্যাসে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব, নানা সমস্যা, গ্লানি, প্রাত্যহিক বিরোধ ও মিলন, এসবকিছু রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যার ফলে পাঠকমনে বাস্তব অনুভূতি দৃঢ় ও প্রবল হয়েছে এবং সমাজজীবনের বিষয়ে বিচিত্র ধারণা ও আদর্শ সম্পর্কে চেতনা জন্মেছে। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস লিখন বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাও বাস্তবনিষ্ঠ।

রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রেমের জয়গান করে সাম্যবোধের, বিশ্বমানবতাবোধের বন্দনা করা হয়েছে। তাঁর রচিত প্রথম দুইটি উপন্যাস 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' মূলত সাম্যদর্শী, মানবতাবাদ ও প্রেমচেতনার স্বার্থক উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে শৌর্য ও প্রেমকে পাশাপাশি রেখে প্রেমের সর্বজয়ী রূপের দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এই উপন্যাসে রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর সর্বনাশা

শৌর্য বা প্রতাপকে স্ফীত করে মানবধর্মকে নিষ্পেষিত করেছেন। প্রতাপাদিত্য শুধু নিজের ক্ষমতা বলবৎ রাখতে সকলের কাছে থেকেও দূরে থাকেন, প্রেমের কোমল স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। এই চরিত্রের পাশাপাশি লেখক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের সর্বজনশুভকামী স্নেহকাতর মানসিকতার চরিত্রটি অঙ্কিত করেছেন। তাঁর ধর্মই ছিল এমন যে আপন-পর, শত্রু-মিত্র সকলকে তাঁর বিশাল হৃদয়ের স্নেহনীড়ে ঠাঁই দিয়েছেন। সর্বব্যাপী প্রেমের মধুর অনুভূতি দিয়ে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। বসন্ত রায়ের এমন সর্বজনে প্রসারিত সাম্যবোধ, মানবতাবাদই তাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি রাজদম্ভ থেকে বহু উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। আর এই চরিত্রের মধ্য-দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদের যে চিত্র সুনিপুণ হাতে ফুটিয়ে তুলেছেন সে কারণেই পাঠক হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তিনি শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন।

মানবতাবাদ, উদার প্রেম ও সাম্যবোধের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও। এই উপন্যাসের মূলে রয়েছে সর্বজীবের প্রতি মমতা ও করুণা। ত্রিপুরার রাজকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসটিতে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের চিরপ্রচলিত জীববলির বিষয়টি বন্ধ হয়ে যায় কেবল ছোট্ট মেয়ের হাসি মমতাভরা হৃদয়ের একটা করুণাবাণীতে। মূলত এই ছোট্ট বালিকার কথাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে যেখানে মানবতাবাদের চিত্র ফুটে উঠে। এই উপন্যাসে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এমন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি অন্তরের মহা বাণী শুনতে পেয়েছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের কথিত রাজাদর্শে মানুষে-মানুষে বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত হয়েছে তাঁর দৃষ্টিতে রাজা যেমন মানুষ প্রজাও তেমন, রাজা প্রজার রক্ষক ছাড়া আর কিছু নয়। শাসক ও শোসিতের মধ্যে সমতা স্থাপনের জন্য যে মানবতার দৃষ্টি এখানে লেখক দিয়েছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তাছাড়া, 'রাজর্ষি' উপন্যাসের শেষভাগে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবসেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ মানবপ্রেম ও সাম্যবোধের জয়গান করে।

মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি অন্তর্নিহিত বিরোধগুলোকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। সমসাময়িক কালের ভাবাদর্শ, বাস্তব জীবনধারা ও নতুন অনুভূতির সমস্ত রূপই তাঁর উপন্যাস 'চোখের বালি'তে দেখা যায়। এখানে জীবনের জটিল মানসিক ভাঙাগড়ার চিত্র সহজ সরলভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। 'চোখের বালি'র ঘটনাস্রোতে চরিত্রগুলো নিজস্ব উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে স্বমহিমায় চিত্রিত হয়েছে। বিনোদিনীই এতে প্রধান চরিত্র, তাকে ঘিরে ঘটনার আবর্তন সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় এবং ব্যক্তিত্বের রূপ ও গুণের সম্বন্বয়ে যথার্থ নায়িকার গৌরবে বিনোদিনীর পদার্পণ ঘটেছে। বিনোদিনী নিজেকে রক্ষা করে, সংযত

করে, মহেন্দ্রকে রক্ষা করলো, মোহমুক্ত করলো এবং শুদ্ধতার পরিচয় দিয়ে বিনোদিনী যে সংযমের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ঘটায় তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে মানবতাবাদের আসল রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিনোদিনী আত্মনিবেদন করেছে, ভালোবাসার প্রতিদান ভালোবাসা পেয়েছে এর বেশি সে প্রত্যাশা করেনি। মানবতাবাদী লেখকই কেবল এমন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারেন, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ভঙ্গিমায়, সামান্যকে অসমান্য দৃষ্টি দিয়ে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠা করেন। লেখক প্রবৃত্তির আগুনে দগ্ধ বিনোদিনীর অন্তরালে যে মহৎভাব আছে তা ফুটিয়ে তুলে বিনোদিনীকে পাঠক মাঝে সমাদরের পাত্র, শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছেন। বিনোদিনী চরিত্র এখনো জীবন্ত, মানুষের মাঝে পরিচ্ছন্নরূপে নিজগুণে উদ্ভাসিত যে কারনে বিনোদিনীকে আজও মানুষ ভালোবাসে। কাহিনীর বিয়োগান্ত না ঘটিয়ে নারী চরিত্রটিকে এতো সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে লেখক মানব মহিমার পরিচয় দিয়েছেন।

'চোখের বালি'র পরের রচনা 'নৌকাডুবি'র পুরো কাহিনী প্রায় আকস্মিক ঘটনার ফ্রেমে বাধা; রমেশ ও কমলার জটিল সম্বন্ধের গ্রন্থি গড়ে উঠেছে এক আকস্মিক বিপর্যয়ের উপর; কমলা ও নলিনাক্ষের পুনর্মিলনও প্রায় সর্বাংশেই দৈবঘটনা নির্ভর।[১৯] কমলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিষ্ঠা ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রেম, ভালবাসা, আবেগ ধীরে ধীরে উচ্ছ্বলিত হয়ে রমেশের পানে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, সে ধীরে ধীরে প্রীতি ও ভক্তিতে রমেশের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে রমেশের হেমনলিনীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ছিল যা তাকে ভদ্রতা ও সরলতার মধ্য দিয়ে তার প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে সংযম এনে দিয়েছে। রমেশের এমন সংযম ও নারীর প্রতি সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদ ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে, হেমনলিনীর চরিত্রে একনিষ্ঠ প্রেম, নলিনাক্ষের শিষ্যা অথবা ভাবী পত্নীরূপে তার পরিচয় খুব স্পষ্ট না হলেও তার বাবার সাথে যে তার সম্পর্ক সেটার মধ্য দিয়ে সুক্ষ্ম সহানুভূতি ফুটে উঠেছে। কিন্তু তবুও তার নিরব, সংযত, সমাহিত স্বভাব, সুক্ষ্ম অনুভবক্ষম হৃদয় ও মন, বিরুদ্ধ শক্তির সামনে অবিচল দীপ্তি নারীত্বের এক নতুন পরিচয় তুলে ধরেছে যা তার চরিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। নারীত্বের এমন আলোকছটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ রূপের মধ্য দিয়ে লেখক মানবতাবাদকেই ব্যাখ্যা করেছেন।

'গোরা' বাংলা সাহিত্যে এমন এক উপন্যাস যেখানে সমগ্র শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশেষ কালের সামাজিক ও রাষ্টীয় চিন্তাধারা, ভাবাদর্শ, ভাবাবেগ, ধর্ম সবকিছুই স্থান পেয়েছে। লেখক এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের সত্তাকে ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সাথে জড়িত করেছেন এবং এই সত্তা বৃহত্তর সত্তা হিসেবে ব্যক্তিগত জীবনের ধাপ অতিক্রম করেছে। এখানে লেখক মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা

অতিক্রম করে বৃহত্তর সত্তার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে প্রবেশ করার বিষয়টি তুলে ধরে বৈশ্বিক মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস জানিয়েছেন। কেবল মানবতাবোধের মাধ্যমেই এমন বৃহত্তর সত্তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এজন্য 'গোড়া' মহাকাব্যের মতো, প্রসার ও গভীরতায় এটা বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস। 'গোরা' উপন্যাসে আনন্দময়ী আদর্শ নারী চরিত্র। আনন্দময়ী যে মানসত্যকে গভীর প্রেম ও মাতৃস্নেহের বোধ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন সে সত্যই এই উপন্যাসে ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানুষই শুধু সত্য, তাই মানুষকে ব্যতিরেকে কোনকিছুই মূল্যবান হতে পারে না, যারা এর বাইরে দলাদলি করে, বিতর্ক ও তর্কে লেগে থাকে তা শুধু মিথ্যে ও অলীকের জন্ম দেয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষই গুরত্বপূর্ণ, মানুষই সত্য এজন্য ব্রাহ্ম-হিন্দু এসব নিয়ে যুক্তি তর্ক বৃথা। মানুষ বৃহৎ ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী, মানুষ কেবল মানুষের মঙ্গলের জন্য, মানব হৃদয়ের ভেতরে কখনো জাতি, বর্ণ, গোত্র বা ধর্মের পার্থক্য নেই। এই মহীয়সী নারীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক মানবসত্য ও মানবধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সর্বমানবের জয়ধ্বনি করেছেন লেখক এই উপন্যাসে।

'চতুরঙ্গে'র জ্যাঠামশাই অনুশীলিত ধর্মসাধনার পথটি ছিল নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও মানবপ্রীতির উদার পথ। জ্যাঠামশাই ছিলেন নাস্তিক, প্রত্যক্ষবাদী, চিত্তশক্তিতে দৃঢ় এবং মানবতাবাদী ছিলেন। প্রচলিত ধর্মে তার বিশ্বাস ছিলনা বরং তাঁর এমন নাস্তিক্যবাদী ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল মানবধর্ম ও মানবসেবা করা। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষসময়ে এসে চিরমানবের, মানবসত্যের, মানবতাবাদের যে স্বপ্ন বুনেছিলেন তার কিছুটা 'চতুরঙ্গে'র জ্যাঠামশাই জগমোহনের নিঃস্বার্থ কর্মের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলে সর্বজনীন মানবধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মানবপ্রেমের সৌন্দর্যময় প্রকাশ ও মানবজীবনের প্রধান চিত্তবৃত্তি প্রেমের গভীরতম রূপটি তুলে ধরে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে যে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী বাস করতো তাদের সামাজিক আদর্শের মূলে ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা, দেশোত্তীর্ণ মানবিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন আদর্শ ও সংকীর্ণ দেশাত্মবোদের সংকীর্ণতর প্রকাশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৎকালীন নগরজীবনে দেখা দিয়েছিল সে দ্বন্দ্ব উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নরনারীর ব্যক্তিজীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছিল এবং যে আবর্ত ঘনাইয়া তুলেছিল তাই মূলত 'ঘরে-বাইরে উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র নিখিলেশ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি না হলেও তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকট, তার অবচেতন চিত্তে স্বার্থবোধের লেশ মাত্র নেই, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের আদর্শ বৃহত্তর মানবিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের তিনটি প্রধান চরিত্র কুমুদিনী, বিপ্রদাস এবং মধুসূদন। মূলত মধুসূদন ও কুমুদিনীর বাল্য ও কৈশোর জীবনের পরিবেশ, এবং তাদের যৌবনের দাম্পত্য জীবনের সুক্ষ্ম ও স্থুল লীলাকাহিনীই এই উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। লেখক কুমুদিনীর প্রেমসুলভ আচরণ ও চিন্তা-চেতনার মধ্যে দিয়ে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মানবিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। কুমুদিনী পরম সহিষ্ণুতায়, নিজের মধ্যে মধুসূদনকে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, তার এমন ধৈর্য্য ও সহানুভূতিশীল আচরণের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার মানবিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়গুলো, ঘাত-প্রতিঘাতের স্তরগুলো, চরম মুহূর্তগুলো লেখক সুক্ষ্ম ও সুনিপুণভাবে রূপায়িত করেছেন। কুমুদিনীর সংযত ব্যক্তিত্ব, কোমলতা লেখক সুকুমার তুলিতে এঁকেছেন, পরম সহানুভূতিতে তাঁর আত্মার সৌন্দর্য রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সার্থক সৃষ্টি 'শেষের কবিতা'র মতো এমন কাব্যোপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রসারতা ও পরিধির দিক দিয়ে এটা বৃহৎ ও মহৎ ছাড়াও মানব সংসারের উত্থান-পতন, সংগ্রাম-কোলাহলের চিত্র, মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণার আভাস, সংস্কৃতিপরায়ণ নরনারীর প্রেম, বিপুলা পৃথিবীর বৃহতের স্পর্শানুভূতির সবল প্রবাহের পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের বিপুল গতিবেগ যেন সঞ্চারিত হয়েছে সুগভীর ভাব-গম্ভীরতায়, এবং বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণে, ভাষা ও বিবৃতিতে এমন প্রাণাবেগ-চঞ্চল-গতিসঞ্চার, কাব্যময় প্রকাশ আর কোন উপন্যাসে দেখা যায় না। লাবণ্যের স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য অমিতের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে গিয়ে তার সমস্ত হৃদয় কেঁদে উঠেছে তবুও সে অমিতকে প্রতিদিনের সঙ্গী করতে পারেনি। এভাবে তিনি লাবণ্যের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়ে নারীর নিজস্বতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন যা মানবতাবাদকেই ধারণ করে ।

'দুই বোন' উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ মানবতার ছাপ রাখেন। এখানে লেখক নারীত্বের দুই রূপ মাতৃরূপ ও প্রিয়ারূপ তুলে ধরেছেন। 'দুই বোন' উপন্যাসের উজ্জ্বলতম চরিত্র শর্মিলা জীবনের এমন পর্যায়ে এসে যে নিদারুণ দুঃখ পেয়েছে সেই অবস্থায়ও অপার ধৈর্য্য ও ক্ষমায়, স্নেহ ও ভালবাসায় স্বামীর নিষ্ঠুর উন্মাদনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং বোনকে নিজের বুকে আশ্রয় দিয়েছে তা শুধু উদার প্রেম ও অপরিসীম মানবতার মতো মহৎ গুণের অধিকারী হওয়ার জন্যই সম্ভব হয়েছে। ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোনে'র সাথে 'মালঞ্চ' উপন্যাসের অনেকখানি মিল রয়েছে। তবে 'মালঞ্চ' আরো

বেশি নিষ্ঠুর ও নির্মম। এখানে নীরজার মধ্যে লেখক শর্মিলার প্রতিরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তার প্রেমের আবেগ উচ্ছ্বাসের মধ্যে এক মানবতার চিত্র খুঁজে পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' এর মূল বিষয় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এলা-অতীনের তীব্র গভীর প্রেম ও তার বিয়োগান্ত পরিণতি। তিনি এ সময়ের তরুণীদের আধুনিকতা ও বিপ্লবী মানসিকতার বিষয়টি যথাপযোক্তভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নারীদের জীবন-আচরণের পরিবর্তন আবশ্যক এটা উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গল্প-উপন্যাসের নাটকীয়তা যেন একটু বেশি মাত্রায় সুস্পষ্ট। সেদিক থেকে 'চার অধ্যায়' এর মূল্য অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের এক সুশৃঙ্খল, সুপ্রশস্ত পথযাত্রা তৈরি করে গেছেন। তাঁর উপন্যাস 'চতুরঙ্গে' নিবিড় চৈতন্য প্রবাহ চরিত্র, ঘটনা ও পরিণামের সুন্দর উপস্থাপনা এবং 'চার অধ্যায়'এ কতকটা ভাব-গভীরতার পরিচয় আছে। আবার, 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' পাঠক চিত্তে পীড়া দেয়। 'গোরা' পরবর্তী রবীন্দ্রোপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় নর-নারীর প্রেমলীলা, বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনাবলি ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে সেই প্রেমের বিচিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করাই রবীন্দ্রোপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে'র পরিধি সংকীর্ণ হলেও এতে দৈন্য-চিহ্ন নাই। এসব উপন্যাস স্বকীয় দীপ্তিতেই উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসগুলোর বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীন মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস জানিয়েছেন। মানুষের অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করে হৃদয়কে রাঙিয়ে তুলে তিনি মানবিকতার চরম স্তরে আরোহণ করেছেন এজন্য তাঁর উপন্যাসের আবেদন এত বেশি।

৪.৪ রবীন্দ্র নাটকে মানবতাবাদ

নাটক মানবজীবনের প্রতিরূপ হিসেবে বিবেচিত। বাঙালির সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করে নাটকের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ভণ্ডামি, মৌলবাদ ও ক্ষুদ্রতার রহস্য বের করে এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এজন্য তাঁকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকারের সাথে সাথে বিশ্বের অন্যতম সেরা নাট্যকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর নাটকে মৌলিকত্বের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা এবং সমাজের মানুষের মুক্তির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের মুক্তির বিষয়ে বলা হয়েছে।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য। মানুষের সাথে মানুষের বিচিত্র রকমের সম্পর্কের যে লীলা বৈচিত্র্য তা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে উৎসুক জাগায়, তাঁর কাছে এটা পরম বিস্ময়ের বিষয়, কবি মানসের মাঝে এই অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত সঞ্চারিত হয়েছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও তারপরের কয়েকটি নাটকে এই প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে।

তাঁর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে অসীমের সন্ধানী ব্যর্থ-সাধন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বেজে উঠেছে:

অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা-কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অনন্ত সকলি।
বালুকার কণা সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে?
বড়ো ছোটো কিছু নাই, সকলি মহৎ।

['প্রকৃতির প্রতিশোধ' "১০ম দৃশ্য"]

এখানে আত্মপরভেদ মুছে যায়। সীমা ও অসীমের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান, সীমার মাঝেই যে অসীমের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ভাবদৃষ্টিতে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই দেহসীমায় আবদ্ধ প্রতিটি মানুষকে অসীমের প্রতিচ্ছবি মনে করে বিশ্বের সকলকে সমান দৃষ্টিতে প্রেমের চোখে দেখেছেন। তাঁর মানবপ্রেম ব্যক্তি, দেশ ও জাতিকে ছাড়িয়ে বিশ্বপ্রেমে পরিণতি লাভ করেছে।

'মায়ার খেলা'তে কয়েকটি তরুণ প্রাণ শুধু নিজের সুখের মোহে প্রেমের মায়ায় ও ভালবাসার ছলনার মধ্যে পড়ে নিজেরা কি করে ভুল করে মরেছে সেটাই অফুরন্ত গানের সুরের ভেতর দিয়ে বলা হয়েছে। ভাবরহস্যের দিক থেকে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এর রহস্য থেকে 'মায়ার খেলা'য় কবি এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। 'মায়ার খেলা'র মধ্যে এই রহস্যই ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রেমকে শুধু নিজের সুখের জন্য চাইলে প্রেমের স্পর্শ পাওয়া যাবে না, সুখও দূরে চলে যাবে, শুধু ভোগের জন্য ভালবাসা ছলনা করে, সংসারের মধ্যে অন্তহীন অপরিমেয়তার সন্ধান পাওয়া যাবে না, আর তা না পাওয়া গেলে জীবনের সার্থকতা সম্ভব নয়। মায়ার খেলাই জীবনের সারাংশ হতে পারেনা।

'রাজা ও রাণী' নাটকটিতে প্রায় সবগুলো চরিত্রের মধ্যেই মানবতার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। এখানে নারীজীবনের সহজ দুর্বলতা কবি হৃদয়ের দরদ ও সহানুভূতিকে অতি সহজেই আকর্ষণ করেছে।

কবি নারী জীবনের নীরব ত্যাগের দিক, স্নেহের দিক, মহত্বের দিককে বড় করে তুলে সমস্ত দুর্বলতাকে ঢেকে দিয়ে মানবতার মধুর দিকটিই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষিত বাঙালির প্রিয় নাটক, ভাববিকাশের দিক থেকে 'বিসর্জন' যেন প্রতি মুহূর্তে লীলা চঞ্চলিত এবং এর প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে সংশয়ের চঞ্চলতা দেখা যায়, যা প্রবলভাবে জয়সিংহের চরিত্রে ফুটে উঠে। জয়সিংহ জীবনের সব দিনগুলো দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যে কাটায়, প্রেমের মধ্য দিয়ে আশ্রয় খুঁজে বারবার গুরুর আদেশে তা প্রতিহত করেছেন। অপর্ণার কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় মন্দিরের দেবী সত্য না অন্তরের বিশ্বাস সত্য, গুরুর আদেশ বড় না প্রেমের আহবান বড়। সে অন্তরের বিশ্বাস, প্রেমের আহ্বানকে বড় জানলেও শেষ পর্যন্ত গুরুর আদেশ, নিষ্করুণ বিধানের কাছে তাকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে। নিজের সত্তার মৃত্যু ঘটিয়ে এমন বিসর্জন কেবল মানবতারই সাক্ষর বহন করে আর এই বেদনার মাঝে রবীন্দ্রনাথ সার্থকতা খুঁজেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনের দুঃখ ও সংঘাতের প্রতি দৃষ্টি রেখে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষকে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। কবির হৃদয়ের প্রেম ও করুণার ভাবটি তাঁর রচিত 'মালিনী' নাটকে পরিস্ফুটিত হয়েছে। 'মালিনী' উপাখ্যানটি মূলত: বৌদ্ধকাহিনী হলে ও এটা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন-কল্পনার সৃষ্টি। এখানে সীমা-অসীমের তত্ত্বদর্শী রবীন্দ্রমানসে বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী-করুণার আদর্শ অন্তর্লীন হয়েছিল। এই নাটকে রাজকন্যা মালিনী বিশ্বপ্রেমের এক মহতী বাণী শুনতে পায় এজন্য নিজেকে রাজগৃহের সংকীর্ণ গণ্ডিতে সে আবদ্ধ রাখতে চায়না এবং মায়ের কাছে প্রার্থনা করে,

ওগো মা শোন মা কথা-
বোঝাতে পারি নে মোর চিত্তব্যাকুলতা।
আমারে ছাড়িয়া দে মা, বিনা দুঃখশোকে,
শাখা হতে চ্যুতপত্রসম। সর্বলোকে
যাব আমি-রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির-সংসার।
['মালিনী' "১ম দৃশ্য"]

এর ফলে মালিনীর জনজীবনের স্পর্শে সর্বজনের প্রতি অফুরন্ত প্রেম ও করুণা জেগে উঠে। তাকে বাহির সংসার থেকে ঘরে ফিরে নিয়ে আসলেও সে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকতে চায়নি। সকলের প্রতি তার প্রেম সমভাবে জেগে উঠে, এই প্রেম তার চিত্তকে ক্ষমাসুন্দর করে তুলে। সেজন্য তার নির্বাসনকামী প্রজাসহ

বিদ্রোহী ক্ষেমংকরকেও সে ক্ষমা করে দেয়। শত্রুমিত্র পার্থক্য ভেদ করে এই মহান প্রেমকে অন্যতম উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে রবীন্দ্রসাহিত্য চিরন্তন সাম্যদর্শী মানবতাবাদের জয় প্রচার করেছে।

'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ', 'সতী' 'নরকবাস' এই চারটি নাট্যকাব্যেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ধর্ম বোধ প্রকাশিত হয়েছে। 'গান্ধারীর আবেদন'এ গান্ধারীর চরিত্রে পুত্রস্নেহ ও স্বামিধর্ম এবং অন্যদিকে সত্য নিত্যধর্ম প্রকাশিত হয়েছে, আবার ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রেও পুত্রস্নেহ ও মানবধর্মের বিরোধ যে দ্বন্দের সৃষ্টি করেছে তাতে মানবতা তার নিজস্ব ধর্মে জ্বলজ্বল করেছে। গান্ধারীর চরিত্রে নাটকীয় মহিমা লাভ করেছে। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' এ কর্ণের চিত্তে একদিকে পালয়িত্রী মাতা সূতজায়া রাধার প্রতি মমত্ব ও কর্তব্যবোধ, দুর্যোধনের প্রতি বীরের ধর্মবোধ, অন্যদিকে গর্ভদাত্রী মা এবং একস্তন্যপায়ী ভাইদের প্রতি নবজাগ্রত একাত্মবোধের চেতনা এসব মানবতারই সাক্ষর বহন করে। 'সতী' নাটকে পিতা বিনায়ক রাও'র চরিত্রে একদিকে সমাজধর্ম ও চিরাচরিত সংস্কার, অন্যদিকে স্বভাবজ পিতৃস্নেহ ফুটে উঠেছে। এই নাট্যকাব্যগুলোর মধ্য দিয়ে নিত্য শাশ্বত মানবধর্মের অম্লান মহিমার প্রকাশ ও মানবতার জয়গান করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মানবতার ধর্মে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ এবং যুক্তিবাদ স্থান পেয়েছে এবং রবীন্দ্র কবিমানসের অন্যতম বাণী হলো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সত্য শাশ্বত মানবধর্মের জয়গান।

'গোড়ায় গলদ' নাটকে নারীকে নিয়ে যুবক মনের উত্তেজনা ও কৌতূহল, পুরুষকে নিয়ে কিশোরী চিত্তে উৎসাহ ও কল্পনা আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অনেক সময় যে কৌতুকাবহ আবর্তের সৃষ্টি করে তা লেখক নাটকীয় কৌতুকে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তি জীবনের যে নিজস্বতা, অন্তরাত্মার যে আকুতি তা তুলে ধরার মাধ্যমে লেখক এখানে মানবতাই ফুটিয়ে তুলেছেন। এর পরবর্তী প্রহসন চার বছর পরে রচিত 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় ভৃত্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক মানবতাবাদের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন।

'শারদোৎসব' রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঋতু-প্রশস্তির নাটিকা। এখানে সম্রাট চক্রবর্তী বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসী সেজে সর্বসাধারণের সাথে মিশে নিজের মানব পরিচয় উদঘাটন করে। সে মানবতাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত, বীণাচার্য সুরসেনের ভক্ত, সহস্র কার্ষপণ দিয়ে বালক উপনন্দের ঋণ পরিশোধ করে, উপনন্দকে আশ্রয় দেয় এবং সামন্ত সোমপালের ঔদ্ধত্যকে সহজ মনে করে ক্ষমা করে এসবই মানবতার দৃষ্টান্ত। তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটির বিষয়বস্তু 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' নামীয় উপন্যাস থেকে গৃহিত হয়েছে। এখানে

প্রহরীদের আচরণে কোমল হৃদয়ের পরিচয় এবং তাদের ধর্মভীরু মন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ন্যায় ও সত্যধর্মের একটা অধ্যাত্ম আকুতি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা' নাটকেও এই রহস্যময় সাংকেতিকতার উপস্থিতি আবার নতুন করে দেখা যায়। এখানে, চরাচরের যিনি রাজা সেই ভগবানকেই এই নাটকে রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের অনন্ত রূপের মধ্যে তাঁর ঐশ্বর্যময় যে রূপ সেটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি প্রিয় তাই এখানে রাজারূপে তিনি নাটকের নায়ক। এখানে সুদর্শনা এক প্রভুকে মনে স্থান দিয়েছিল । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "সুদর্শনার প্রভু কোন বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, তিনি সকল দেশে সকল কালে। আপন অন্তরের আনন্দরসে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় এ নাটকে তাই বর্ণিত হয়েছে।" [২০] রবীন্দ্রনাথ ভগবান বা বিশ্বাত্মাকে বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে না দেখে সকল রূপে, সকল স্থানে, সকল দ্রব্যে খুঁজেছেন।

'অচলায়তন' নাটকে তিনটি ভিন্ন দল তিন মার্গে সাধনা করেছে, তিন মার্গের মধ্য তারা কোনরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা করেনি, তারা নিজ নিজ সাধন পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পন্থা বলে গ্রহণ করেছে এবং তিন দলই একই গুরুর অন্বেষণ করেছে। এই নাটকে অচলায়তনিকদের প্রাণহীন আচারের ও মননহীন মন্ত্রের প্রতি কবি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন কিন্তু জ্ঞানমার্গের মৌলিক মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে বলেন জ্ঞানমার্গের তপস্যায় মানুষের মন যতই শুষ্ক হোক না কেন, এই শুষ্কতাই তার মনকে সংহত করে, সংযত করে এক প্রকার রুদ্রশক্তি দান করে। এমন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কবি মনুষ্যত্ববোধের, মানবতাবাদের বিষয়টিই উপস্থাপন করেছেন।

'ফাল্গুনী' নাটকে শীতের জরাতে পৃথিবীর দীনতা প্রকাশিত হওয়ার পর যে বসন্ত আসে এবং বসন্তে পৃথিবী নতুনভাবে ধরা দেয় এই সত্য কবি মানবজীবনের বার্ধক্যজাত জরা ও তার পরবর্তী নতুন জীবনের প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির জীবনে ও মানব জীবনে এই লীলার ধারা বর্তমান, বসন্ত মানুষের মহত্তর যৌবনের প্রতীক এর মধ্যে সুখ-দুঃখ, আনন্দ সবই আছে, কর্মের আহ্বানও আছে। এজন্যই এটা মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পারে।

'রাজা' নাটকের পরিবর্তিত নাট্যরূপ 'অরূপরতন'এ পদাতিকগণের মনোজ্ঞ ভূমিকা লক্ষণীয়। তাঁদের আচরনে স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকাশ পায়। যা মানবতাবাদকে ধারণ করে। 'শারদোৎসব'র পরিবর্তিত

নাট্যরূপ' ঋণশোধ' এ রাজা বিজয়াদিত্য বিনা আয়োজনে বিনা সৈন্যে একাকী বিজয় অভিযানে যাত্রা করেন এবং নাটকে যেসকল মন্ত্রী চরিত্র রয়েছে তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ এবং রাজ্যের প্রকৃত কল্যাণ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত ছিল।

'মুক্তধারা' নাটকের সাথে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের কিন্তু মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে একাধিক জনতা আছে কিন্তু 'মুক্তধারা'র জনতা অনেক, এটি পথের কাহিনী, এর জনতাও পথিক জনতা। মানুষ যখন এক তখন তার ব্যক্তিত্ব থাকে কিন্তু যখন সে জনতার মধ্যে আত্মনিমজ্জন করে দশের এক হয়ে যায় তখন তার ব্যক্তিত্ব ঘুচে যায়, সমষ্টির পরিচয়ই তখন তার একমাত্র পরিচয়। 'মুক্তধারা'র জনতার মধ্যে ব্যক্তি পরিচয় নাই কিন্ত চমৎকার সমষ্টি পরিচয় আছে এবং ব্যক্তিপরিচয় বিলীন করে দিয়ে একাত্মতা পোষণ করে যে সমষ্টি পরিচয়ের রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে তুলে ধরেছেন তা মানবতার ধারক ও বাহক।

গীতধর্মী নাটক 'রক্তকরবীর' সমস্ত পালা নন্দিনী নামে এক মানবীর ছবি, চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। প্রেম ও সৌন্দর্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণ রূপ, নন্দিনী তার প্রতীক। প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক, প্রাণশক্তির প্রতিমূর্তি নন্দিনী হাতছানি দিয়ে সকলকে ডাকলো, যক্ষপুরীর কারাগারের ভিতরে এক মুহর্তে সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলো, মুক্ত জীবনানন্দের স্পর্শে সকলে বসন্ত বাতাসের সুবাস অনুভব করলো। প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদই ফুটে উঠেছে।

'রাজা ও রাণী' নাটকের নতুন রূপ দিয়ে সাজিয়ে লেখা 'তপতী' নাটক। এই নাটকে বিক্রমের মন্ত্রী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্পষ্টবক্তা, কর্তব্যনিষ্ঠ ও রাজ্যের শুভানুধ্যায়ী। তিনি মহারাজা কে সম্মান করেন কিন্তু স্পষ্টভাষণে নির্ভীক । তিনি মন্ত্রগৃহের বাইরে মন্ত্রণা করেন না, নিন্দনীয়দের নিন্দা করে থাকেন, কিন্তু কৌশল করে নয়, এ জাতীয় আত্মঘোষণায় তিনি দ্বিধাহীন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এমন বৈশিষ্ট্য মানবতাবাদেরই দৃষ্টান্ত। এরপর 'কালের যাত্রা' রূপক নাটকে গর্বিত সৈনিক ও বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মন্ত্রীর ভূমিকা রয়েছে। এখানে মন্ত্রী রাজা ও রাজ্যের শুভানুধ্যায়ী, সৎ, ভালোমানুষ, বিচক্ষণ ও রাজনীতিজ্ঞানী। মন্ত্রীর মননশীলতা লক্ষ্যণীয়, স্পষ্টবক্তা ও নির্ভীকও বটে। 'কালের যাত্রা'র মন্ত্রীর গোঁড়ামি মুক্ত মননশীলতা তাঁর ভবিষ্যত দর্শনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

তাঁর 'শেষ বর্ষণ' ও 'বসন্ত' নাটক ঋতু উৎসবাশ্রয়ী হলেও এখানে কবির কল্পনা মানসের চিত্র আছে। রাজা ও রাজসভা বিষয়ী, আনন্দের মধ্যে বিষয়াসক্তি আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে ভোগে বাধা দেয় যা

প্রকৃতির সাথে মানবচিত্তের গভীর মিলনে প্রতিবন্ধক। কবি অনাবিল সৌন্দর্যের পূজারী হিসেবে নিসর্গের সাথে মানবচিত্তের নিগুঢ় পরিপূর্ণ মিলনে বিশ্বের আনন্দোৎসব পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করার চেষ্টা করেছেন এসব নাটকে। 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'র ভিতরে এই বাণীটি আরো গভীরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নটরাজ কাল দেবতা পালাগানের ভিতর দিয়ে মহাকালের গভীর নৃত্যলীলা, বিভিন্ন ঋতু, রং, চিত্র, আবেগ ও জীবনের গভীরতম ব্যঞ্জনা আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন এবং আহবান করেছেন চিত্তকে বন্ধনমুক্ত করতে, বিশ্বের সৌন্দর্যের মধ্যে এক অখণ্ড সামঞ্জস্য দান করতে।

রবীন্দ্র সাহিত্য দূরাবগাহ। এই বিশাল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে একটা প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন এবং মানুষে মানুষে সাম্য স্থাপনের কথা বলেছেন। মানুষ যখন গভীর অনুভূতির ভিতর দিয়ে তার ক্ষুদ্রজীবনকে বিশ্বজীবনের সাথে মিলিত করে দেয়, নিজেকে যে যখন বিশ্বজগতে সম্প্রসারিত করে, তখন তার কাছে ক্ষুদ্র বলে কিছু থাকেনা, আত্মপরভেদ ভুলে যায়, সকলের সাথে সে গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলোর মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। মানুষে মানুষে সাম্য স্থাপনের এই যে মনুষ্যত্ববোধ ও সাম্যবোধ সেটাই রবীন্দ্রনাথের মানবীয় সত্তাকে আমাদের কাছে বরণীয় করে তুলেছে।

৪.৫ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ডায়রিতে মানবতাবাদ

রবীন্দ্রসাহিত্যের কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও গানে যেমন মানবতাবাদ স্থান পেয়েছে তেমনই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ডায়রিতে মানবতার স্থান আলোচিতব্য। তাঁর প্রবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয় হলো পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবন। এই জগৎ ও জীবনের নানা বিষয় বলতে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসকল সামাজিক সমস্যার মূলে থাকে মানুষে মানুষে বিভেদ ও বৈষম্য এজন্য রবীন্দ্রনাথের লেখায় সাম্য ও মানবতার ভিত্তিতে সমাজগঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্পের পাশাপাশি প্রবন্ধ রচনায় ও এই বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যেমন, তেমন প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যলেখার ভিতরে নিবন্ধ আছে, প্রবন্ধ আছে, অল্পায়তনের রচনা আছে, এই সকলের ভিতরে ধর্ম আছে, ইতিহাস আছে, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি সম্বন্ধে বহু আলোচনা রহিয়াছে-প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য এবং 'অত্যাধুনিক' সাহিত্য সম্বন্ধেও আলোচনা রয়েছে, জীবন-স্মৃতি আছে, ছিন্ন এবং অছিন্ন পত্র আছে, পঞ্চভূতও রহিয়াছে- আর রহিয়াছে

একটি ভাবস্থ বিশেষ মানসিক অবস্থানকে অবলম্বন করিয়া আত্মনিষ্ঠ রচনা। [২১] তাঁর 'পত্রধারা', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'ছিন্নপত্রাবলী', 'ভানুসিংহের পত্র', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে' প্রভৃতি রচনা এবং কবির মরণোত্তরকালে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত স্ত্রীপুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধবকে লেখা পত্র এবং অন্যদিকে ডায়রি-'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি', 'পঞ্চভূত', 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়রি' এসবের মধ্যে যেখানে মানবতাবাদ আছে সেগুলোই এখানের আলোচ্য বিষয়।

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়রি'তে আছে এক পাখাওয়ালার কাহিনী, তার অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্য কবির মনে ব্যথা সৃষ্টি করেছে। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের সাধারণ গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি ও মমত্ববোধ চিরকালই অক্ষুন্ন ছিল। 'পঞ্চমভূতের ডায়ারি'র অন্তর্গত 'মনুষ্য' প্রবন্ধেও মানবতাবাদের চিত্র দেখা যায়। এই প্রবন্ধে মুহুরী আর বিপত্নীক লক্ষীছাড়া বেহারা নিহরের কথা আছে, এখানে বৈষ্ণবীয় দাস্যভক্তির স্বরূপ ও প্রভুভক্তি দেখা যায়। মানবজীবনের অভিজ্ঞতাশূন্য কবির মানবপ্রেমের উচ্ছ্বাস ও আবেদন মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই, মানুষের নৈরাশ্যপূর্ণ চিত্র ছাড়াও কবির সহানুভূতিশীল দৃষ্টির আলোকে দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। ব্যথিত মানুষের প্রতি করুণা প্রকাশে মানবতাবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' এ সংকলিত প্রবন্ধগুলোতেও মানবতার কথা আছে।

তাঁর আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ 'জীবনস্মৃতিতে' তিনি বলেছেন, "আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে সময় গিয়েছে, ইহা একটি অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। ... ... অপরিণত প্রদোষালোকে আবেগগুলি সেইরূপ পরিমাণ বহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষকে ও কেউ জানে না ... ... জীবনের সেই একটা অকৃতার্য অবস্থায় অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে। [২২] তিনি অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করার জন্য নিজস্ব সত্তার সন্ধান পাওয়ার জন্য সারাজীবন সেই বাল্যকাল থেকে প্রৌড় কাল পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। জীবনস্মৃতিতে বাল্যকালের ছবি বিভিন্ন রেখায় এঁকেছেন। মানবাত্মার আপন সত্তাকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য, নিজের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যেই তাঁর এই মানবতাবাদের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি 'জীবনস্মৃতিতে' আবার বলেছেন, "আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোকে একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।" [২৩]

তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরাকে লেখা ছিন্নপত্রাবলীর পত্রসমূহ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসঙ্গমে কবিচিত্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ সম্পর্কে লিখিত। কিছু পত্রে দাস-দাসীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবির মানবতাবাদী চিত্তের বিবরণ পাওয়া যায়। কয়েকটি পত্রে কবির প্রাত্যহিক জীবনে ভৃত্যদের উপর নির্ভরশীলতা প্রকাশিত হয়েছে। তারা যে কবির বিপদে আপদে, সুখে-দুঃখে সহায় ও সঙ্গী ছিলেন সেটাই স্পষ্ট হয়েছে। মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, মমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। তাছাড়া, ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত বেশ কয়েকটি কবিতায় তাঁর এ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে লিখিত একটি পত্রে তিনি বলেন: "যে জিনিসে প্রাণশক্তির অভাব, ইনজেকসনের চোটে তাকে ধরফড়িয়ে তুলে মনে সান্ত্বনা পাইনে। মৃতের ভার বহন করতে আমি উৎসাহ পাই যে, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত, কিন্তু সে যেন অতীত নয়, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করাটা অসঙ্গত।" [২৪] ঐ বছরের এপ্রিল মাসে কবি আরেকটি পত্রে লিখলেন, "শান্তিনিকেতনে ১১ মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সংকোচ বোধ হয়না, কিন্তু আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড়ো লজ্জা দেয়।[২৫] কবি জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বিকশিত করেছিলেন তাঁর মানবতাবোধ দ্বারা যা বিশ্বমানবতায় রূপ নিয়েছে। যে মানবতা নিজের অন্তরাত্মাকে বিশুদ্ধ করে, নিজের ভেতরকার শক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটিয়ে নিজের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে বিশ্বমানবের মহিমায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। যেখানে ব্যক্তি জীবন বড় নয়, বিশ্বজীবনে প্রবেশ করার মাধ্যমে বিশ্বমানবিকতায় অংশগ্রহণ করেছে। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে কবি যেমন ভাবুক আত্মমগ্ন, আবার তিনি মানবকল্যাণেও ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

'ভানুসিংহের পত্রাবলী' তে কবি নতুন জীবনে প্রবেশ করেছেন। 'ছিন্ন পত্রাবলী'র পূর্ণ যৌবন শেষে এখানে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ। এই পত্রাবলীর প্রধান আকর্ষণ বনমালী। বনমালী কর্মে অপটু হলেও রসিক চরিত্রের ছিল বলে কবির কাছে খুবই প্রিয় ছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি তাঁর ভৃত্যদের যতটা অন্তরঙ্গভাবে চিনেছিলেন এমন আর কাউকেই নয়, তিনি প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদী ছিলেন বলেই সামান্য ভৃত্য মানুষের সত্যরূপটি চিনেছিলেন। 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধেও ভৃত্য মোমিন মিঞার চরিত্র এসেছে কর্মের সর্বগ্রাসী দাবি প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে নয়, মানুষের দাবি নিয়ে। প্রতিদিনের কাজকর্মের অন্তরালে খানসামা মোমিন মিঞার মানব রূপটি কবির কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবি তাঁর মানবিক সাহিত্যতত্ত্বকে রূপ দিতে যেসব পরিচিত ব্যক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন এরা বেশিরভাগই ভৃত্য।

তাঁর মানবতাবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেলে 'The Religion of Man' এবং 'মানুষের ধর্ম' নামক দুটি গ্রন্থে। 'The Religion of Man' গ্রন্থের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, "সমস্ত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তিনি একটি বিশেষ তত্ত্বকেই ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন,আর সেই তত্ত্বটি হলো 'মানবধর্ম'। তিনি আমাদের আরো জানিয়েছেন যে,তাঁর সমস্ত রচনা কর্মের মধ্যেও সেই চিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছে।" [২৬] তিনি মানবতার জাগরণ অনুভব করেছেন বাল্যকাল থেকে, ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সত্যকে, নিজের পরমসত্তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি এখানে মনের মানুষের ধারণা দিয়েছেন, যে মানুষ মানুষের অন্তরাত্মায় বাস করে, তাকে তিনি আদর্শ পূর্ণ মানব বলেছেন। এই মনের মানুষ মানবিক সত্তায় ধরা দেয়। এর মাধ্যমে মানুষ নিজে তার হৃদয়কে দেখতে পায়, নিজের সম্পর্কে জানতে পায়, কবি নিজেও এর মাঝেই মনের মিল খুঁজেছেন। তিনি মানবতার ধর্ম প্রচার করেছেন।

আবার, 'মানুষের ধর্ম' এর কেন্দ্রীয় বিষয়ই হলো "মানুষ হও"। সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই মানুষের অনন্তের সাধনার সফলতা নির্ভর করে। তাই মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে তাঁর প্রশ্ন "আমি কী এবং আমার চরম মূল্য কোথায়।" [২৭] তিনি আত্মানুসন্ধান করেছেন, তিনি আত্মমুখী ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবতাবাদ থেকে বৈশ্বিক মানবতাবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

'আত্মপরিচয়ে' কবি বলেছেন, "সেই একদিন তখন বালক ছিলাম। জানিনে কোন উদয়-পথ দিয়ে প্রভাত সূর্যের আলোক এসে সমস্ত মানব সম্বন্ধকে আমার কাছে অকস্মাৎ আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে দেখিয়েছিল।" [২৮] তার এই রচনাকর্মের মূলে ছিল মানবতাবাদের অনুভূতি। মানবতাবাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্পর্কে এই গ্রন্থে বলেন, "আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না- তার সঙ্গে কেবলমাত্র অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরমবেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়।" [২৯] এভাবে তিনি পারিবারিক ধর্মবোধের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে উপনীত হন এবং মানবতার অমোঘ বাণী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

কবির পরিকল্পিত 'স্বদেশী সমাজ' এ পরকে আপন করা, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করার মতো চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ সম্পর্কে বলা আছে যা এখনো অনস্বীকার্য। এই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিটি নরনারী একে অপরের সাথে প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। 'পল্লীসমাজে'র সংকীর্ণ

গণ্ডীতে যে প্রভুভৃত্য তথা মানুষে মানুষে যে ঐক্যবোধ জাগ্রত ছিল বৃহত্তর স্বদেশি সমাজেও সেই মানসিকতা সক্রিয় হবে বলে তিনি আশা পোষণ করতেন। এসব কিছু কবির পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব হয়েছে কেননা মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন ছিলেন তিনি, প্রতিনিয়ত মানবতার চেতনা তাঁর মনে বিরাজ করতো ।

রবীন্দ্রনাথ সমাজের ভেদাভেদের সাথে মানুষের আচরণেও যে ভেদ আছে তা উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতবর্ষীয় সমাজের ভিত্তি হলো বর্ণাশ্রম, সহযোগিতা এখানে জীবনধর্ম আর পাশ্চাত্য সমাজে মানুষ-মানুষে প্রতিযোগিতাই জীবনের মূল বিষয়। এখানে যা আনন্দ ও মিলন ওখানে তা সংগ্রাম ও সংঘর্ষ। তিনি তাঁর 'সমাজভেদ' প্রবন্ধে ও অন্যান্য রচনায়ও এই পার্থক্যটা তুলে ধরেছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় সমাজের মূল আদর্শকে সামনে রেখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মাচর্য বিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন। আবার, ইউরোপ যাত্রায় জাহাজের কেবিনে সেই গরিব পাখাওয়ালার ঘটনা তাকে ব্যথিত করেছিল। তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'তে এবং 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'তে তিতি পাইক, নায়েব, খানসামা, বেহারার কথা বলে তাদের সুখী সমৃদ্ধ জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে অতি সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি, মায়া ও মমত্ববোধ রয়েছে। সমাজসভ্যতা, নরনারী ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর কবি মনের মননশীলতা ও মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে মানবিক জীবনের প্রতিটি ঘটনা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছে তিনিও এসব উপেক্ষা করেননি।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ মানবিক মরমি মানুষ। সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যকে তিনি চিরায়ত বিশুদ্ধগীতিময়তায় বিভোর করেছেন। তাঁর বিশ্বাতীত বোধ, মানবপ্রেম, মননশীলতা এসবকিছু শেষ পর্যন্ত মানবিকতাকেই স্পর্শ করেছে। আর সেই মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর লিখিত কবিতা, গল্প, কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটকে। তিনি মানবিক চেতনায় নিজেকে জাগ্রত করেছেন এবং মরমি সাধনার মাধ্যমে নিজেকে ঋষিতূল্য করেছেন। তাঁর রচনাকর্মের প্রতিটি পরতে পরতে আছে বাঙালির যাপিত জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাঙালির হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, জীবনের সকল রঙ তিনি নিজস্ব ভঙ্গিমায় এঁকেছেন। তাঁর এমন বোধ ও চিন্তা-চেতনা, বহুমাত্রিক সৃজনশীলতা সাহিত্য ও শিল্পের সব শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর দেখানো পথে বাঙালি আজও নতুন পথ খুঁজে। তাঁর বহুমাত্রিক সাহিত্যের আবেদন সারাবিশ্ব জুড়ে। তিনি বেঁচে থাকা অবস্থায়ই ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলীও অনুদিত হয়েছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবিকতা, মানবিক সম্পর্কই হচ্ছে প্রধান বিষয়। মানুষে মানুষে যে সর্ম্পক তা দ্বন্দ্ব মূলক, প্রতিযোগিতামূলক ও ভক্তিমূলক তিনি এ সব বিষয়ই সাহিত্যে তুলে ধরেন। তিনি সাধনা করেছেন আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে মানব সম্পর্কের স্বরূপ উদঘাটনের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধনের জন্য। আর রবীন্দ্র সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের উৎসই ছিল চলমান ও সমগ্রবাদী জীবনদর্শন পর্যালোচনা করা, এর মূলে স্থান পেয়েছে মানুষের সমগ্র জীবনের অনি:শেষ ধারণা, রেনেসাঁসের উপলব্ধি ও অঙ্গীকার এবং তিনি সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে মানুষকেই প্রাধান্য দেন। ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করার পাশাপাশি তিনি হৃদয়াশক্তি, সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির সমন্বয়ে ব্যক্তির মধ্যে সামগ্রিক সত্তার সন্ধান করে তা বিকশিত করার চেষ্টা করেন। মানবজীবনের বহুমাত্রিক রূপ অনুসন্ধান করাই তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য ছিল।

মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি পরাধীন জাতির মুক্তির কথা বলেছেন। তিনি মানুষকে যথার্থ সহমর্মিতার চোখে দেখেছেন, মানুষের পীড়ন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছেন। স্বদেশ ও সমাজের ভাবনাতে তিনি ব্যাকুল ছিলেন এবং তিনি মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার উৎকর্ষ সাধনে পরমোৎকর্ষে আবেগ, ঐতিহ্য, ইতিহাসের আলোকে স্থাপন করেছেন আন্তঃমানবিকতা। পরম মমতায় মানুষের মধ্যে পার্থক্যের সর্ম্পকের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন ও মহৎ আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তিনি সৌন্দর্যবোধ ও মহামানবদের উপলব্ধিকেই সারাজীবন লালন করেছেন। তাঁর মতে পরম সত্তার শ্রেষ্ঠ রূপ বিশ্বমানবের রূপে প্রতিফলিত হয়। অসহায়, শোষিত, বঞ্চিত ও সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ ও সাহচর্য তাঁর মানবতাবাদের মূল কথা এবং তাঁর ধর্ম হচ্ছে মানবধর্ম, তিনি আন্তর্জাতিকতা মনে ধারণ করে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। নিজের আত্মশক্তির জয়গান করেছেন, নৈতিক শক্তি ও সংহতির সংমিশ্রণে মানুষের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, মানুষের কাছে তাঁর সাহিত্যের আবেদন চিরদিনব্যাপী থাকবে।

তথ্য নির্দেশিকা

০১। Rabindranath Tagore (1931), *The Religion of Man*, London, George Allen and Unwin, Introduction.

০২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫০, ১লা বৈশাখ), *আত্মপরিচয়*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ৭৮

০৩। নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯, ২২ শে শ্রাবণ), *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৪৭

০৪। সুনীল চন্দ্র সরকার (১৩৬৮, ২৫ বৈশাখ), *আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব*, রবীন্দ্রায়ন, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বাক্ সাহিত্য, পৃ. ১৯৬

০৫। রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত (১৯৮২), *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তা*, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃ. ৩৮৯

০৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৩), *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালা: ১২ পূর্ণ, পৃ. ৪৮৩

০৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৭৩), *প্রভাতসংগীত*, সূচনাংশ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী

০৮। প্রাগুক্ত

০৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৮৪, জ্যৈষ্ঠ), *কালান্তর*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্বিংশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪৩৭

১০। ড. এম. মতিউর রহমান (২০১২), *বাঙালির দর্শন: ব্রাহ্ম ভাবধারা*, *৩য় খণ্ড*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ৩৬৪

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৮০), *'প্রভাতসংগীত' সূচনাংশ*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৭৫), *'কবির মন্তব্য'*, *কড়ি ও কোমল*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী,

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬৭), *'ছিন্নপত্র' শিলাইদহ*, ১৩ আগষ্ট, ১৮৯৪, পত্রসংখ্যা ১১৫, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুনরমুদ্রণ, শ্রাবণ, পৃ. ২৩০

১৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায় (১৩৮৯), *রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ*, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩১১

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫৫), *পথের সঞ্চয়*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষড়বিংশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ৫৬৭

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬০), *শান্তি নিকেতন*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪৪৪

১৭। হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় (১৩৮৫), *রবীন্দ্রদর্শন*, কলিকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করন, পৃ. ৪৬

১৮। Rabindranath Tagore (1918) *Personality,* London, Macmillan and Co. Limited St. Martins street, P. 31

১৯। নীহাররঞ্জন রায় (১৩৪৮), *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৪০৫

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৩৬৮), *রাজা*, *গ্রন্থ পরিচয়*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী

২১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৭২), *বাঙলা-সাহিত্যের একদিক*, পৃ. ১৪১

২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮১), *জীবন স্মৃতি*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ৯৯

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

২৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬১), *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ৩৬৫

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

২৬। তুলনীয়: Rabindra Nath Tagore (1988), *The Religion of An Artist, Angel of Surplus,* Calcutta: Visvabharati Granthan Vibhag, পৃ. ৫

২৭। Rabindranath Tagore (1931), *The Religion of Man, The Four Stages of Life,* London: George Allen and Unwin, পৃ. ৫৬

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬৮), *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ২২৩

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্র ভাবনায় শ্রেয় ও প্রেয়

রবীন্দ্র ভাবনায় শ্রেয় ও প্রেয়

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় উপনিষদ ও বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব রয়েছে। এখান থেকেই তিনি ধর্মের আদর্শ লাভ করেছিলেন। তিনি মনে করেন ব্রহ্মকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জানার দরকার নেই, এতে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা আসে ফলে জীবনের বিচিত্র সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব হয়। সংসার থেকে ব্রহ্মকে বিচ্ছিন্ন করে একাকী সম্ভোগ করায় কোন সার্থকতা নেই। তাছাড়া, পার্থিব জগতের সংসার তো ব্রহ্মেরই মন্দির। ব্রহ্মপরায়ণ হয়ে জ্ঞান, ভোগ ও কর্মের দ্বারাই ব্রহ্মের মন্দির স্বরূপ এই সংসারেই ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। এই সংসার যেমন কর্মক্ষেত্র তেমনই ধর্মক্ষেত্রও। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ধর্মজীবন সংসারে থেকেও যাপন করা সম্ভব।

তিনি নিরাসক্ত ভোগের মাধ্যমে সংসার জীবনে অবস্থান করে ধর্ম পালনের কথা বলেন যা ভারতবর্ষের একটি শাশ্বত আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের নিরাসক্ত ভোগ ও ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'নৈবেদ্য' গ্রন্থে । এখানে বলেন,

"হে ভারত তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন
বাহিরে তাহার অতি অল্প প্রয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।
আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধির পুষ্ট বিলাস লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর ঘর্ঘর,
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়
নিঃসংকোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরবগৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল, নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ।
কে রাখিবে ভরি নিজ অন্তর-আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার।" [১]

রবীন্দ্র দর্শনে শ্রেয় ও প্রেয় দুটোরই ভূমিকা রয়েছে। শ্রেয় ও প্রেয় সম্পর্কে জানতে হলে কতগুলো বিষয় জানা জরুরী । আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা রকমের কাজ করে থাকি। যা আমাদের আধ্যাত্মিক

সত্তা প্রকাশ করে, এগুলো সবসময় আমাদের অভ্যাসের জন্য নয় বরং এগুলো আমরা সৃষ্টি করি যার কোন ঐহিক উদ্দেশ্য নেই। এসব কাজ সম্পাদন করে আমরা ধন-সম্পদ, দীর্ঘায়ু এমন পার্থিব লাভ ক্ষতি করতে চাইনা। অর্থাৎ এই কর্মগুলো এক বিশেষ শ্রেণীর যা আমাদেরকে ত্যাগের মাধ্যমে গভীর তৃপ্তি সাধন করে এটাই হলো শ্রেয়, একে আনন্দ বলা যায়। কিন্তু এই আনন্দ অনুভূতি 'আমি আনন্দিত' এমন উপলব্ধি জাগায় যা আমার আমিত্বের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না বরং আনন্দ অনুভূতি ও আমার অস্তিত্ব 'আমিত্ব' এটা অদ্বৈততার জন্ম দেয়। এভাবে মানুষ সত্যলাভ করতে চায় এবং সত্য লাভের দুই পথ শ্রেয় ও প্রেয়। মানুষের সকল কাজকর্ম তথা মানুষকে নানাভাবে এই দুইটি আবদ্ধ করে রেখেছে। কেবল শ্রেয়ের পথ গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আসে এবং যে প্রেয়ের পথ অবলম্বন করে সে অধোগামী হয়। শ্রেয়বস্তু লাভের জন্য যে কর্ম সম্পাদন করা হয় তাকে সৃজনশীল কর্মও বলা যায়। প্রাপ্য বস্তু লাভের সকলেরই কামনার যোগ্য এবং আকাঙ্ক্ষিত।

৫.১ শ্রেয় ও প্রেয়

শ্রেয় ও প্রেয় শব্দ দুটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত হলে ও এর অর্থ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। যা অল্প সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এবং অন্তিমে দুঃখজনক তাকে বলা হয় প্রেয় অর্থাৎ যা কিছু কাম্য তাই হলো প্রেয়। অন্যদিকে, যা লাভ করা পরিশ্রম সাপেক্ষ, কিন্তু চিরস্থায়ী এবং সুখদায়ক সেটাই হলো শ্রেয় অর্থাৎ সৃজনশীল কর্মের প্রাপ্যই হলো শ্রেয়।

শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু দুটোই আমাদেরকে আকর্ষণ করে থাকে। আর, প্রেয় বস্তু পাওয়ার জন্য যে তাড়না অনুভূত হয় তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ শারীরিক বা মানসিক অস্বস্তি অনুভব করে। অন্যদিকে, শ্রেয় সাধনা সুখকর, শ্রেয় বস্তু যেহেতু পার্থিব কোন বস্তু নয় এর সাধনা আজীবনই ব্যাপ্ত এখানে প্রাপ্তির সময় নির্দেশের সুযোগ নেই। তাছাড়া, শ্রেয় সাধনা ও প্রাপ্তির প্রতিটি স্তরে সমগ্রতার স্বাদ উপলব্ধি হয়। প্রেয় বস্তুর ধর্ম হলো এর বিকল্প থাকে, বেছে নেয়ার সুযোগ আছে, আর এই ধর্মের কারণে প্রেয় বস্তু সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হয় অর্থাৎ প্রেয় বস্তু একেক সময়ে এককটা হতে পারে। আমরা আমাদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সুবিধামতো স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন প্রেয় বস্তুর মধ্য থেকে এক বা একাধিক বস্তু নির্বাচন করে থাকি। সময়ের প্রয়োজনে মানুষের বয়সের সাথে সাথে মানসিক পরিবর্তনের সাথে প্রেয়ত্বেরও পরিবর্তন হয়। বাল্যকালে যা প্রেয় তা যৌবনে প্রেয় নাও হতে পারে আবার যৌবনে যা প্রেয় বার্ধক্যে তা অপ্রিয় হতে পারে। কিন্তু শ্রেয় সাধনার ক্ষেত্রে এমন সুযোগ নেই।

শ্রেয় বস্তুর একটা অনিবার্যতা আছে এবং এটা সাধনা করার যে সময়কাল তা দ্বারাই শ্রেয় বস্তুর অসীমত্ত ও ঐক্য নির্ধারিত হয়। শ্রেয়বস্তু লাভের ক্ষেত্রে প্রেয় বস্তুর মতো নির্বাচন করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, শ্রেয় বস্তুর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো এটা অনন্ত ও এক। শ্রেয়বস্তু শাশ্বত ও এক হওয়ার জন্য এটি অপরিবর্তনশীল ও গতিশীল। আমাদেন দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রকার কর্মপন্থাগুলোর মধ্যে যখন কোন একটা নির্বাচন করি তখন অনিয়ন্ত্রিত সংকল্প (decision) নিয়ে থাকি। তবে এসব ক্ষেত্রে বাছাই করা (Choosing) এবং নৈতিক সংকল্প (deciding) শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থ বহন করে। আমরা আমাদের প্রয়োজনের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকারের কর্ম নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বাছাই করা শব্দটি ব্যবহার করে থাকি কিন্তু কোন কর্মের উপযোগিতা পরীক্ষা করে কোন উপযোগিতাকে কেন তুলনামূলক বেশি মূল্য দেই এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে নৈতিক সংকল্প ব্যবহার করি। নৈতিক সংকল্পমূলক বাক্যের উদাহরণে বলা যায়, 'কিন্তু আমার মনে হয় . . . এই যে এখানে আমার মনে হওয়ার বিষয়টি সেটা কারোর কাছে গ্রহণযোগ্য হতেও পারে আবার নাও পারে। তবে এটা সত্য না অযার্থ এটা নিয়ে বিতর্ক নেই। এবং এটা ঠিক যে নৈতিক সংকল্প শ্রেয় জ্ঞাপক এবং তাই এটাকে নৈতিক নির্বাচনজনকও বলা যায়। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রকার নির্বাচন বহির্ভূত তথ্যের সাহয্যেই নৈতিক নির্বাচনের যথার্থতা দেখানো সম্ভব।

আবার, শ্রেয় চেতনা ও সত্তা চেতনা মূলত এক কেননা বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে একই ধর্ম বিদ্যমান, উভয়ের মধ্যে একই সার্বিক ধর্ম বর্তমান তাছাড়া শ্রেয় চেতনাকে সত্তা চেতনার বহি:প্রকাশ বলা যায়। যখন আমার সত্তা ও অস্তিত্ব নির্দেশ করি তখন শ্রেয় চেতনার আশ্রয় নিয়ে থাকি। অর্থাৎ যে বাক্যে চরমরূপে শ্রেয় চেতনা আছে তা মূলত বিশুদ্ধ সত্তাজ্ঞাপক বাক্য। যেমন: অস্তিত্ব জ্ঞাপক 'আমি আছি' বাক্যটি শ্রেয় চেতনার রূপনির্দেশক বাক্য, এবং 'আমি আছি' বাক্যটিতে আমিত্বে অস্তিত্ব আরোপ করা হচ্ছে না এবং এখানে অন্যের অস্তিত্ব জ্ঞাপক 'সে আছে' বাক্যেরও সমপর্যায়ের নয়। প্রকৃতপক্ষ্যে এই বাক্যটি বিভিন্ন সংশ্লেষক বাক্য 'বরফ সাদা', 'আকাশ নীল', 'বাড়িটি হলুদ', এসব বাক্যের মতো হলেও প্রথম বাক্যটি ব্যক্তির সত্তা চেতনার এবং গভীর বোধের শব্দগত প্রকাশ। অর্থাৎ এটা শ্রেয় চেতনার রূপনির্দেশক বাক্য এজন্য সত্তাই চরমতম শ্রেয়। শ্রেয়চেতনা সত্তাচেতনারই প্রকাশ।[২] আর, সৃজনশীলতাই যথার্থ অস্তিত্ব এবং শ্রেয় চেতনা যখন আমাদের চারপাশে আবেষ্টন করে রাখে তখন কর্মও সৃজনশীল হয়ে উঠে এর ফলে আমাদের সত্তা চেতনা আরো গভীরভাবে আমাদের জগতের বিভিন্ন তথ্য সমাহারের উর্ধ্বে উঠে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৫.২ রবীন্দ্র ভাবনায় শ্রেয় ও প্রেয়

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় সসীম ও অসীম উভয়কে যেমন স্বীকার করা হয়েছে তেমনই তাঁর চিন্তা-চেতনায় শ্রেয় ও প্রেয় দুটোরই ভূমিকা রয়েছে। তিনি শ্রেয় সাধনাকে সত্তা উপলব্ধির সহয়ক হিসেবে মনে করেন এবং এটা ধর্ম সাধনার নামান্তর বলে তিনি মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষ সত্তার উপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধির জন্য মানুষ তাঁর হৃদয়ের গভীরে এক ব্যাকুলতা অনুভব করে এবং ব্যাকুলতার ফলশ্রুতিতে মানুষের শ্রেয় বোধ ঘটে। সত্তার প্রধান ধর্মই হলো প্রকাশ তাই শ্রেয় চেতনায় তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। অসীমের দৃষ্টিকোণ থেকে সত্তা নির্গুণ এবং মানুষ সত্তা প্রকাশ করতে চায় যে কারণে মানুষের বিভিন্ন সাধনায়, সভ্যতায়, ইতিহাসে ও বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মপ্রয়াস ও কর্মোদ্যাগে এর বিচিত্র রূপ দেখি। মানুষ সবসময় তার সৃজনশীল কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে সত্তার অনন্ত সম্ভাবনার বৈচিত্রের উপলব্ধি ও প্রকাশের সাধনা করে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, এর প্রভাবেই তিনি ব্রহ্ম সর্বত্রই বিরাজমান বলে মনে করেন। এই সত্তাকে ছান্দোগ্য উপনিষদ কথিত ভূমার সাদৃশ্য বলে মনে করেন এবং শ্রেয়বোধ হলো সত্তার শক্তি। মানুষ তার নিজের সত্তা প্রকাশের জন্য শ্রেয় সৃষ্টি করে। এজন্য প্রয়োজন, "To realise that to live as a man is great, requiring profound philosophy for its ideal, poetry for its expression heroism in its conduct." [৩] যেহেতু সত্তা প্রকাশের তাগিদে মানুষ শ্রেয়কে সৃষ্টি করে তাই তার ধর্ম এবং সৃষ্টি করা শ্রেয় মানুষের ইতিহাসে সৌন্দর্য, মঙ্গল ও শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের ধারণায় রূপ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেয়য়োদর্শনে দেশ-কালের উর্ধ্বে ও কার্যকারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ নয় এমন মানুষের কথা বলেছেন। এই মানুষকে তিনি সর্বজনীন মানব (Universal Man) হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর ভাববাদী দৃষ্টিকোণের আলোকে মানুষের সত্তা, তার প্রকাশধর্মিতা ও শ্রেয়োবোধ সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তিনি Person- সংক্রান্ত সমস্যা 'দার্শনিক আমি' কে পৃথিবীর সীমা এবং পার্থিব বস্তুসমূহে এর সন্ধান পাওয়া যাবেনা বলে মনে করেন। ব্যক্তি চেতনার তুলনায় 'দার্শনিক আমি' ন্যায়গতভাবে পূর্ববর্তী এবং সমস্যার মূল প্রশ্ন হলো অভিজ্ঞতার কেন্দ্রস্থলে এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন তিনি তার 'জীবন দেবতা' ধারণায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "What I mean by personality is a self conscious principle of transcendental unity within man which

comprehends al the details of facts that are individually his in knowledge and feeling, wish and will and work ." [৪] রবীন্দ্রনাথ একে মানব-ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি মনে করেন, সকল জীবকুলের মধ্যে কেবল মানুষই বহুমুখী চরিত্রের পূর্ণ রূপে পৌছায়। আর মানুষের চেতনার অভিব্যক্তি ব্যক্তিত্বের জগতের সাথে এক পূর্ণ ঐক্যের মধ্য দিয়ে জগতে সত্য-প্রাপ্তির সন্ধান করেছিল। তিনি আরো মনে করেন, মানব ঐক্যের সত্যকে যে নামই দেয় না কেন তবে বিষয়টি কখনো অগ্রাহ্য করা যাবেনা। আমরা যখন অন্যের মধ্য দিয়ে নিজেদের অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই তখনই সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাভ করি যার নাম হলো প্রেম। আর জগতে মহৎ সমগ্রকে এই প্রেমই তুলে ধরে যা মানুষের পূর্ণ ও চরম সত্য। মানুষের মাঝে অন্তর্নিহিত এক সৃজনীশক্তি রয়েছে যার কারণে মানুষ তার সকল দুঃখকে জয় করে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরো মনে করেন প্রতিটি মানুষের মধ্যে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি নামক গুণ রয়েছে অর্থাৎ জীববৃত্তি গুণের কারণে এটা বুঝা যায় যে, মানুষ জীব এবং এর প্রাণ আছে কিন্তু মানুষের প্রাণের চেয়েও বড় যা সেটা মনুষ্যত্ব হিসেবে বিবেচিত। এটাই তার আসল সৃজনীশক্তি এবং মানুষের ধর্ম হচ্ছে এই অন্তরতম সত্যের বিকাশ সাধন করা। মানুষ অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির মাধ্যমে তাঁর অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য লাভ করার চেষ্টা করে। আমারা দৈনন্দিন জীবনে যেসকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই সেই সকল অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার পূর্ণ মীমাংসা হলো সামঞ্জস্য ও ঐক্য। আর সৃজনীশক্তির প্রধান তত্ত্ব যেহেতু সামঞ্জস্য তাই এর মাধ্যমে ব্যক্তিচেতনা কে সুশৃঙ্খলভাবে সুবিন্যস্ত করে তাকে সুন্দর, সুগভীর ও এক তৃপ্তিকর তাৎপর্য বহন করে। এর ফলে মানুষ জ্ঞানে, কর্মে ও অনুভবে সর্বত্র সামঞ্জস্য বিধান করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এবং এই অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের 'বিশ্বরূপ' বলে অভিহিত করেছেন। মানুষের এক প্রান্তে তার বিশ্ব, অন্য-প্রান্তে তার বিশেষত্ব। এই দুই দিয়ে তার সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ।[৫]

রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও ভাবনায় এই অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির ভূমিকা অনেক। তিনি তাঁর শ্রেয়োদর্শনে বলেন অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তিই শ্রেয় চেতনার উৎস ও কেন্দ্রস্থল। সেজন্য এটি মৌল ধারণা। তিনি বিশ্বরূপের ধারণার মধ্যে উদ্বৃত্তের ব্যঞ্জনা আছে বলে মনে করেন এবং সৃজনীশক্তির কোন একটি প্রকাশেই এই উদ্বৃত্ত নিঃশেষ হয়ে যায়না।

রবীন্দ্রনাথের মতে এই উদ্বৃত্তের লীলা মানুষের শ্রেয় সাধনার ক্ষেত্রে অসমাপিকার ভূমিকা পালন করে। এবং এই উদ্বৃত্ত সৃজনীশক্তির দ্বারা মানুষ তার বিশ্বরূপ রচনা করে থাকে কোন স্থান-কাল, দেশ-ভেদে পরিমাপ করা যায়না। অন্যদিকে, দেশ ও কালে এই বিশ্বরূপকেই মানুষ বিভিন্ন চরিতার্থ পূরণ করতে ব্যবহার করে। তাই মানুষের শ্রেয় চেতনায় প্রকাশিত বা মানুষের শ্রেয় সাধনা এই সাধনায় মানুষ নিজেকেই প্রকাশ করে থাকে। এই যে নিজেকে প্রকাশ করার আকুতি তা এক ক্রমশ বৃহৎ সামঞ্জস্য লাভের কর্মপ্রয়াস । এই সামঞ্জস্য ও ঐক্য সৃষ্ট শ্রেয় অভিজ্ঞতার দ্বারা অপর মানুষের ও বিশ্ব প্রকৃতির সাথে আত্মবোধ থেকে বিশ্ববোধ, স্বার্থ থেকে পরমার্থে, মানবতা থেকে বিশ্বমানবতায় উত্তীর্ণ হওয়াই মানুষের ধর্ম যেখানে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির উদ্বৃত্তই তার প্রবণতা। তাই রবীন্দ্রনাথের শ্রেয় দর্শন তাঁরই অভ্যাসগত বিবরণ বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শন বুঝতে হলে এই শ্রেয়োদর্শনের কতগুলো ধারণা রয়েছে সেগুলো জানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেয়োদর্শনের প্রধানতম ধারণা হিসেবে সৌন্দর্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন সৌন্দর্য সত্তা, উদ্বৃত্ত, সামঞ্জস্য এসবের মতো একটি মৌল ধারণা এটা বিচার করা আপেক্ষিক বিষয়। সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য হলো এটা পরিগ্রহ, বিচার এবং সত্তা চেতনাজাত। অর্থাৎ 'আমি আনন্দিত' এই বোধের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৌন্দর্যবোধে যে মুক্তি আসে তা আমাদের সমগ্র মানবব্যক্তিত্বের মুক্তি আনে। তাছাড়া, মানুষের শ্রেয় সাধনায় তার মানবব্যক্তিত্বের সীমার অন্তহীন প্রসারণের প্রয়াস থাকে। যখন আমাদের প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি আমাদের চেতনাকে উদ্দেশ্যমুখীন করে তোলে তখন আমরা শ্রেয়কে খুঁজি এবং শ্রেয় প্রাপ্তির মধ্যদিয়ে আমাদের দেহ-মনের পিপাসা দূর হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্যবোধকে বুদ্ধিবৃত্তি থেকে আলাদা করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে তথ্যকে অবান্তর ও গুরুত্বহীন মনে করেছেন। পক্ষান্তরে সত্যকে মূখ্য বলেছেন। সত্যকে প্রধান বিষয় হিসেবে এর বৈশিষ্ট্যে বলেন যে সত্য মানবব্যক্তিত্বের আনন্দময় স্বরূপের সৃজনশীল প্রকাশ করে। তিনি সৌন্দর্যকে সত্তার পরিপূরক বলে মনে করে সৌন্দর্য সাধনাকে শ্রেয় চেতনাজাত হিসেবে ব্যাখা করে মনে করেন সকল সৃজনশীল কর্মই আত্মোপলব্ধির সাধনা এবং তিনি মনে করেন, যেসব ক্ষেত্রে সত্তাবোধ বা আত্মোপলব্ধি যত নিবিড় সেখানে আমাদে শ্রেয় চেতনা ততই গভীর। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানবব্যক্তিত্ব সৌন্দর্য বিচার করার প্রধানতম মৌলিক ধারণা। তাই আত্মোপলব্ধিই সৌন্দর্য সাধনার ও বিচার করার প্রধান লক্ষ্য। তিনি সৌন্দর্য সাধনার মূল খুঁজেছেন সত্তা চেতনার সামঞ্জস্যে। আর সৌন্দর্য সাধনাই শ্রেয় সাধনা তাই চরম সৌন্দর্যর অভিজ্ঞতা আত্মোপলব্ধির নামান্তর।

শ্রেয়োদর্শনের কতগুলো ধারার মধ্যে মঙ্গল অন্যতম এটা শ্রেয়োনীতির যেহেতু মূল প্রত্যয় তাই এটা সত্তাদর্শনের সাথে অঙ্গীভূত। প্রকৃতপক্ষে, দেহ ও মনের সম্পর্কের মতো সৌন্দর্য ও মঙ্গল একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। আর, মঙ্গল মানুষের অন্তরতর সৌন্দর্য তাই এর অধিষ্ঠান ও উৎস মানবসত্তার উদ্বৃত্ত। যে উদ্বৃত্ত প্রকাশধর্মী এবং সৃজনশীল কর্মে প্রকাশিত। এজন্য মঙ্গল কর্মগুলোকে সৃজনশীল কর্ম বলা যায় এবং এর মাধ্যমে সত্তার ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া এর মাধ্যমে আমাদের আত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ মঙ্গল সাধনা করা আত্মোপলব্ধির উপায়। এমনকি মানবসত্তা সামঞ্জস্য স্বরূপ বলে মঙ্গলকর্মের অনুসন্ধানে আমরা এক অখণ্ড ঐক্যবোধের অধিকারী হয়ে যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করি।

রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকে কোন পার্থিব গুণ বলেননি বরং একে আধ্যাত্মিক সত্য বলেছেন এবং মঙ্গলময়তার বিচার আবেগমূলক বাক্যে প্রকাশিত হয়। তিনি মঙ্গলধর্ম এবং কল্যাণকে সমর্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মঙ্গলের আশ্রয় হিসেবে প্রেমকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি প্রেমকে শ্রেয়নীতির চরমতম প্রত্যয় বলেছেন এবং প্রেমের অনুভূতি সবসময় সক্রিয়। আর শ্রেয়নীতির মূল বিশ্বপ্রেম আর প্রেমের সক্রিয়তা আমাদেরকে বিশ্বকর্মা করে তোলে। প্রেমের কর্মবাচকতার জন্যই প্রেম শ্রেয় নীতির চরমতম প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত। রবীন্দ্রনাথের মতে, শ্রেয়োদর্শন ও সত্তাদর্শন অভিন্ন এজন্য সত্তাদর্শন অভিন্ন বলে ধর্মসাধনার তত্ত্ব দিয়ে সত্তার উপলব্ধি ও তার বিভিন্ন প্রকাশের বিবরণ দেওয়া সম্ভব। তিনি বলেন সত্তার ধর্ম হলো শ্রেয় এবং ধর্ম শ্রেয়স্কর। আর, শ্রেয় ছাড়া সত্তা মানুষের ধর্মে স্বীকৃত নয়। এজন্য তাঁর শ্রেয়োদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কর্মকে সৃজনশীলতার আলোকে নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনের আরো একটি প্রধান ধারণা হলো ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা। তিনি ব্যাখ্যা করেন, মানবিক শ্রেয় চেতনা থেকে আমরা ঈশ্বরে পৌছাই। তিনি মনে করেন, কল্যাণের পূর্ণতার মূর্তি হলো ঈশ্বর। এই মূর্তির মাধ্যমে মানুষ তার মানবত্বের অনুভূতিকে উপলব্ধি করে এবং মানবিকতার মাহাত্ম্য অবলম্বন করেই ঈশ্বরের কাছে পৌছে । ঈশ্বরকে তিনি মানবব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন, তিনি মনে করেন মানুষের আত্মিক সম্পদ গুলো মানুষের সত্তার উদ্বৃত্তে অভাসিত এবং মানবসত্তা বিশ্বমানবিক সত্তার ঐক্যে বিধৃত এবং এই ঐক্য ইন্দ্রিয়াতীত ঐক্য। তিনি বিশ্বমানবিক সত্তাকেই মানব ব্রহ্ম এবং বিশ্বমানব বলেছেন। এভাবেই ব্যক্তিমানবের আত্মোপলব্ধি ঘটে বিশ্বমানবের সঙ্গে সামঞ্জস্যবোধে।

এসব আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রবীন্দ্র ভাবনায় প্রেয়র চেয়ে শ্রেয়র গুরুত্বই বেশি। তিনি তাঁর চিন্তায় ও কর্মে শ্রেয়কেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর চিন্তায় ও কর্মে প্রেয়'র স্থান খুবই নগণ্য। তিনি তাঁর শ্রেয়দর্শনে সুন্দর ও মঙ্গলকে সত্যোপলব্ধির বিষয় বলে অভিহিত করেছেন এবং সেই সত্য হলো মানবসত্তা। মানবজীবনের কোন অভিজ্ঞতাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। আর এই কারণেই মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণতা শ্রেয় সাধনার চরম লক্ষ্য। তিনি শ্রেয় সাধনাকে মানুষের আত্মোপলব্ধির সাধনা বলে অভিহিত করেছেন। মঙ্গল মানুষের অন্তরতম সৌন্দর্য । আর, মঙ্গলকর্মের দ্বারা মানুষ তার অসীমের সম্ভাবনাকে দেশে-কালে প্রবেশ করে, আর এই প্রকাশের দ্বারা মানুষ তার সত্তার উদ্বৃত্ত, তার আত্মার সীমাহীন বিস্তৃতি উপলব্ধি করে। আর এখানেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা।

তথ্য নির্দেশিকা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬২), *নৈবেদ্য*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ১০৬

২। শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য (১৩৭৫), *রবীন্দ্রদর্শন*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ৭৭-৭৮

৩। Rabindranath Tagore (1922), *Creative Unity*, London, Macmillan and Co. Limited St. Martins street, P.183

৪। Rabindranath Tagore (1931), *The Religion of Man*, London, George Allen and Unwin, P.119.

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৩), *শান্তিনিকেতন*, *বিশেষত্ব ও বিশ্ব*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১২শ খন্ড, পৃ. ১৩৯

উপসংহার

উপসংহার

মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা ছিল মানবপ্রেম ও মানবকল্যাণ সাধনা করা। আর মানবকল্যাণের পূর্বশর্ত হলো প্রেম। তিনি জগৎ সংসারকে প্রেমের লীলা হিসেবে বিবেচনা করে নিখাদ প্রেমের মধ্যে তাঁর বিশ্বানুভূতি এবং মানবিকতাকে খুঁজেছেন। তিনি যে প্রেমের কথা বলেছেন তা হলো সৃষ্টির সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে, জীবন দেবতার সঙ্গে এবং যা কিছু মহৎ ও কল্যাণ বয়ে আনে তার সঙ্গে। মানুষকে তার আত্মিক মহিমায়, আধ্যাত্মিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি।

অসাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ যে মানুষকে ঈশ্বরের সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে মানুষকে চিরমানব, মহামানব বা পরমমানব নামে অভিহিত করেছেন। যাকে তিনি মানবব্রহ্ম বলেও অভিহিত করেছেন। তিনি ধর্মকে শুধু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত করেননি, মানুষের স্বাধীনতা, মুক্ত জ্ঞান, বিচার-বিবেচনার সাথে এর যেন কোন বিরোধ না থাকে সেই প্রচারণা চালিয়েছেন।। তিনি যে ধর্মের কথা সারাজীবন মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন সে ধর্ম মানুষের চিন্তা-বুদ্ধি, কর্ম, হৃদয়বোধ সর্বোপরি মানুষের জীবনের সকল বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে। তিনি ধর্মকে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেবল জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মই মানুষের জীবনকে সত্যপথের নির্দেশ দিতে পারে, তবে শুধু জ্ঞানের মধ্যে প্রেমের ও কমের্র প্রেরণা থাকেনা। তাই প্রেমই জীবনকে কল্যাণের পথে প্রেরণা দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন মানবধর্মে জ্ঞানের অগ্রগতির সাথে এগিয়ে চলার শক্তির সাথে সাথে জীবনের সর্ববিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার কথা বলেছেন। তাঁর মানবতার ধর্মে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের সমন্বয় ঘটেছে। তিনি প্রেমের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে উপনিষদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। উপনিষদ থেকে তিনি ধর্মের আদর্শও গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে উপনিষদের গভীর উপলব্ধি ও অনুশাসন লাভ করেছিলেন। পিতার আদর্শকে তিনি মনে প্রাণে ধারণ করেছিলেন। তিনি মনে করেন ব্রহ্মকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে একাকী পেতে চাইলে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় জীবনের আসল উদ্দেশ্য লাভে সফলতা আসেনা। পার্থিব সংসার হলো ব্রহ্মের মন্দিরের মতো তাই এর মধ্য দিয়েই ব্রহ্মকে খুঁজতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মানবধর্মে মানুষই মানুষের আরাধ্য, মানুষই দেবতা, মানুষের মাঝেই যে মহামানব আছে তাকে খুঁজে পাওয়াই ধর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া বলে তিনি মনে করেছেন। তাঁর ঈশ্বরচিন্তার ধারণা পাওয়া যায় 'নৈবেদ্য' কাব্যে। তিনি পার্থিব সংসারে থেকে ধর্ম পালনের আদর্শকে নিরাসক্ত ভোগ হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং সংসারের মায়া-ভালবাসার মাঝেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার কথা বলেন। এটা ভারতবর্ষেরও শাশ্বত আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি উপনিষদের নিরাসক্ত ভোগের সাথে ভারতবর্ষের ঈশ্বরকে উপলব্ধির বিষয়ে যে চিরন্তন আদর্শ রয়েছে তা এই 'নৈবেদ্য' কাব্যেই তুলে ধরেছেন। পরবর্তীতে তাঁর ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা-চেতনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্য' কাব্যে। তাছাড়া, 'ব্রহ্মপনিষদ; 'ব্রহ্মমন্ত্র', 'উপনিষদ ব্রহ্ম', ভারতবর্ষ', 'মানুষের ধর্ম', 'ধর্মের অধিকার' এসব গদ্যগ্রন্থেও ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর চিন্তা- চেতনা প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়।

তাঁর সকল সৃষ্টির আধার ছিল এই উপনিষদ, পরম ব্রহ্ম এবং পরম সত্য উপলব্ধি করে ব্রহ্মের কাছে নিজেকে সমর্পিত করা। তিনি তাঁর প্রার্থনা সংগীতে প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিশালত্বের কাছে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। আত্মসমর্পনের আকুতি জানিয়ে ঠাঁই চেয়েছেন ঈশ্বরের কাছে। তিনি উপনিষদের অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলেই তিনি ব্রহ্মাউপাসক হতে পেরেছিলেন। । এই ব্রহ্ম সাধনা অমরত্বের পথিক হিসেবে তাকে ঋষির মর্যাদা দিয়েছে বিশ্ব দরবারে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন মানবকল্যাণের পথ ধরেই পরমেশ্বরের মূলে যে আনন্দরূপ আছে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর দর্শনে বিশ্বানুভূতি, মানবতাবাদ, সাম্যচিন্তা এসবকিছু অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি তাঁর সাহিত্যের সকল শাখায় অর্থাৎ কাব্য, কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধে মানবিকতার জয় ঘোষণা করেছেন এবং অখণ্ড মানবিক চেতনাকে আশ্রয় করে তাঁর সাহিত্য-রচনা করেছেন।

তিনি মানব সংসারের ভেদাভেদ, বৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনা ও ক্ষুদ্রতা দেখে অসীম বেদনা অনুভব করেছেন এবং এই বেদনা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্য, সাম্য ও মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে। তিনি মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও সমবেদনার হাত প্রসারিত করেন এবং সামাজিক ভেদাভেদ দূর করার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য প্রকাশ করে মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছে তাঁর পূর্ণ রূপায়ন ঘটাতে চেয়েছেন। তাছাড়াও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ডাক দিয়ে সাম্যভিত্তিক এক উন্মুক্ত জীবনদৃষ্টি প্রসারিত করে মানুষকে তাঁর জীবনের পরমার্থের সন্ধান দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতাবাদ ও মানবতাবোধের যে চিত্র দেখি তা বিশ্ব দরবারে স্বমহিমায় স্থান দখল করে আছে। তাঁর দর্শন মানুষকে স্বাধীনচেতা, অসাম্প্রদায়িক, নিঃস্বার্থ, ও যুক্তিবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়। তাঁর মানবমুখী দর্শনে মানুষের প্রতি, জীবের প্রতি ও কল্যাণকর কর্মের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র কিন্তু সকল ব্যক্তিমানুষের হৃদয়ে এক মহামানব বাস করে, যে মহামানব প্রতিটি মানুষকে আত্মমুখী মানবতাবাদ থেকে বিশ্বজনীন মানবতাবাদের দিকে ধাবিত করে। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে বিশ্ববাসীর সকল মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদী দর্শনের চর্চা ও প্রচার করেন। তাঁর মানবতাবাদী দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল মনুষ্যত্বের সাধনা, মানুষের সর্বাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা এবং এই সাধনা দেশ-কালের, ধর্মীয় গণ্ডির উর্ধ্বে ছিল। সুতরাং তাঁর এই উপযোগী দর্শন আজকের আধুনিক জীবনে চর্চা ও প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে ভেদ-বৈষম্যহীন ও শান্তিপূর্ণ এক মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক উৎস

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯০), *ভারতপথিক রামমোহন রায়*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯১), *আত্মপরিচয়*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯১), *মহাত্মা গান্ধী*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৩), *মানুষের ধর্ম*, কলকাতা,বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৩), *খৃষ্ট*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৫), *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৫) *ইতিহাস*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৮), *ধর্ম*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০০), *সভ্যতার সংকট*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০০), *অরবিন্দ ঘোষ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০০), *বুদ্ধদেব*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৭), *গীত-বিতান*, অখণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬১), *জীবন স্মৃতি*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬২), নৈবেদ্য, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৬), *গীতাঞ্জলি*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৬), *শিক্ষা*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬৭), *য়ুরোপযাত্রীর ডায়রি*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬০), *ছিন্ন পত্রাবলী*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৮৮), *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬২), *সমাজ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫৩), *স্বদেশ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬২), *স্বদেশী সমাজ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩৯-২০০০), *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১ম-৩১শে খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৭), *চিঠিপত্র-৯*, পত্র সংখ্যা-২, বিশ্বভারতী

২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৪) *'ছিন্নপত্র'* শিলাইদহ, পত্রসংখ্যা ১১৫, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

Dhaka University Institutional Repository

২৬। Rabindranath Tagore (1949), *The Religion of Man*, London: George Allen and Unwin

২৭। Rabindranath Tagore (1922), *Creative Unity*, London, Macmillan and Co. Limited St. Martins street

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক উৎস

১। অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯৬২), *রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী

২। অমিতাভ চৌধুরী (১৯৭৬), *জমিদার রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৩। অমল হোম (১৯৫৫), *পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা: লিমিটেড

৪। অরবিন্দ পোদ্দার (১৯৬০), *রবীন্দ্রমানস*, কলকাতা, ইন্ডিয়ানা, ২য় সংস্করণ

৫। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় (১৯৬৯), *সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী

৬। অসিত কুমার (১৯৭১), *রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লি.

৭। আবু সয়ীদ আইয়ুব (২০০৩), *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, পুন:মুদ্রণ

৮। আলোক ভট্টাচার্য (১৯৮০), *আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লি.

৯। আহমদ শরীফ (২০০১), *রবীন্দ্র ভাবনা*, ঢাকা, সমর প্রকাশনী

১০। এম. মতিউর রহমান (২০১২), *বাঙালির দর্শন: ব্রাহ্ম ভাবধারা*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

১১। ড. এম. মতিউর রহমান (২০০০), *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ (উনিশ শতক)*, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা

১২। ড. এম. মতিউর রহমান (২০১৪), *রবীন্দ্রদর্শন: মানুষ ও সমাজ*, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী

১৩। তারকনাথ ঘোষ (১৩৬৯), *রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা*, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

১৪। নীরু কুমার চাকমা (১৯৯৭), *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি

১৫। নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯), *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৬। প্রতিমা রায় (১৩৮৩), *রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন*, কলকাতা, গোপা প্রকাশনী

১৭। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬১), *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬১), *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১৯। বিনয় ঘোষ (১৯৭৬), *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লঙম্যান

২০। শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য (১৩৭৫), *রবীন্দ্রদর্শন*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

২১। শ্রীমতী তুষারকণা রায় (১৯৮৫), *রবীন্দ্রচেতনায় মানবধর্ম*, কলকাতা, সমীর পুস্তকালয়

২২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯৬১), *উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস*, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কোং

২৩। সত্যেন্দ্রনাথ রায় (১৩৮৯), *রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ*, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

২৪। সুনীল চন্দ্র সরকার (১৩৬৮), *আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব*, রবীন্দ্রায়ন, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বাক্ সাহিত্য

২৫। হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় (১৩৮৫), *রবীন্দ্রদর্শন*, কলিকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করন

২৬। Auguste Comte (1957), *A General view of Positivism*, New York, Cambridge University Press

২৭। George H. Sabine (1951), *A History of Political Theory*, London, Oxford and IBH Publishers

২৮। J. J. Rousseau (1948), *The Social Contract*, tr. By Henry J. Tozer, London, Swan Sonnenschein & Co.

২৯। N. K. Chakma (2007), *Buddhism in Bangladesh and other Papers*, Dhaka, Abosar

৩০। W.T. Stace (1972), *A Critical History of Greek Philosophy*, Macmillan, St. Martins Press

৩১। Rabindranath Tagore (1918), *Personality*, London, Macmillan and Co. Limited St. Martins street